বুককা

- মাখরাজ খান

বাদামের নাও, বাদামের নাও
পান খাইয়া যাও, আমাগো বুড়ির
বুককা অইছে, তুইলা লইয়া যাও।

ছোটবেলায় কতোবার যে এই ছড়াটি শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তখনো যেমন *বুককা* অর্থ জানতাম না, এখনো জানি না। কারো কাছে যে জিজ্ঞাসা করবো বুককা অর্থ সে সাহসও হতো না। কেন জানি আমার মনে হতো বুককা অর্থ এমন কিছু যা বললে হয়তো যার বুককা হয়েছে সে লজ্জা পাবে। তখনকার বুককা প্রসঙ্গে এ পর্যন্তই। এরপর বুককা শুনেছিলাম সুফিয়ার মুখে। সে কাহিনীই শোনাবো।

সুফিয়া এক সময় আমার ছাত্রী ছিল। লেখাপাড়ায় খুব ভালো না হলেও তার অন্যান্য গুণের জন্য তাকে পছন্দ করতাম। শ্যামলা রঙের এই মেয়েটি পড়ানোর সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও বক্তৃতা বা নৃত্য অনুষ্ঠানে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

বলতে বাধা নেই, আমিও তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হলো সুফিয়ার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। সুযোগও একদিন এসে গেল।

তখন বর্ষাকাল। আমি থাকতাম সাটুরিয়া আর সে থাকতো কাঠালিয়ায়। সাটুরিয়া থেকে কাঠালিয়ার দুরত্ব স্থলপথে যাই হোক, নৌপথে তিন কিলোমিটার এটা আন্দাজ করেছিলাম যেদিন তাকে ডিঙি নৌকায় করে কাঠালিয়া নিয়ে যাই।

আমাদের নৌকা চলছে কচুরিপানা আর আমন ধানের মাথার ওপর দিয়ে।

সুফিয়া চুপচাপ বসে। কোনো কথাই বলছে না।

আমিই প্রথম শুরু করি, সুফিয়া, তুমি নৌকা চালাতে পারো?

চালাইনি, তবে চেষ্টা করলে বোধ হয় পারবো।

কিভাবে?

এই বৈঠা দিয়ে আপনি যেমন পানিকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়ার মতো নৌকা নিয়ে যাচ্ছেন।

বললাম, নৌকা তো ঘোড়া নয়। নৌকা হলো তোমার মতো যে কথা বলে না শুধু তাকিয়ে থাকে আর যখন বলে তখন সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সে কারো দিকে ফিরেও তাকায় না।

সুফিয়া মুচকি হেসে বললো, আপনার কথাগুলো টিভির শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের মতো।

কেমন?

যেমন তার চোখ ফেরে না। কিন্তু অন্যদেরও যে চোখ ফেরে না।

সত্যি বলেছো। দেখো, আমাদের এই ডিঙি নৌকা চলছে। এবং এর দিকে সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ধান গাছ আর কচুরিপানা। যদিও আমি নৌকা চালাচ্ছি। তবুও আমার চোখ পড়ে আছে তোমার চোখের ওপর।

সুফিয়া মনে হয় লজ্জা পেল। সে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে আমার দিকে পেছন ফিরে বসলো।

তুমি লজ্জা পাবে জানলে আমি এ নৌকা নিয়ে আসতাম না। বললাম।

মেয়েদের লজ্জা পেতে হয়। তারা তো আপনাদের মতো সব কথা বলতে পারে না। সুফিয়া বললো।

পুরুষেরাই কি সব বলতে পারে? আমি আর সুফিয়া এক নৌকায় কিন্তু কিছুই তো বলতে পারছি না। অথচ যখন রওনা হই তখন ভেবেছিলাম আজ সব কথা বলবো। বলেই ফেলবো।

সুফিয়াই এবার নীরবতা ভঙ্গ করলো।

মনে করেছিলাম আপনি ভালো চালাতে পারেন। কিন্তু এখন দেখছি আমাকেই বৈঠা ধরতে হবে।

বললাম, তাই? তুমি তাহলে আমার জীবন নায়ের বৈঠা ধরো সুফিয়া।

কথা বলে তার কাছে চলে এলাম আর জড়িয়ে ধরে তার বাম গালে চুমু দিলাম।

সুফিয়া শিউরে উঠে কাপা কাপা কণ্ঠে বললো, আর এগোবেন না, তাহলে *বুকক্কা অইবো।*

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ থেকে

মন্ত্রী

- এস.এম আবদুল খালেক

বেশ কিছু দিন আগের কথা। তখন ঢাকায় থাকি। একটা সরকারি ব্যাংকে চাকরিরত এবং যাত্রাবাড়ীর পূর্বে কুতুবখালী এলাকায় বাসা ভাড়া করে সপরিবারে থাকতাম। মাঝে মধ্যে বাবা মাকে দেখার জন্য সিরাজগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে আসতে হয়। তখনো যমুনা সেতু হয়নি। ভুয়াপুর হয়ে লঞ্চে যাতায়াত করতে হতো।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। হাফ অফিস করে মহাখালী থেকে বাসে চড়ে ভুয়াপুর ঘাটে যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। তখনো লাস্ট ট্রপ ছাড়েনি। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে যাবে। যাত্রী খুব বেশি ছিল না। আমরা কয়েকজন লঞ্চের দোতলার ক্যাবিনে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই লঞ্চ ছেড়ে দিল।

মাগরিবের নামাজের সময় হওয়াতে দুই তিনজন যাত্রী ক্যাবিনের ভেতরেই নামাজ আদায় করে নিলাম।

লঞ্চ চলছে। সন্ধ্যার আবছা আলো-আধারিতে যাত্রীরা বিভিন্ন আলাপ করে সময় কাটাচ্ছি। আমার পাশের সিটের ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। তিনি তার ডাক্তারি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। পশ্চিম আকাশে চাদের আলো ক্যাবিনের জানালার কাছাকাছি এসে পড়েছে। অদূরে কাশবনগুলো মৃদু মন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে। সন্ধ্যার ঝিরিঝিরি বাতাসে মোটামুটি ভালোই সময় কাটছিল।

হঠাৎ মাঝ নদীতে বিপরীত দিক থেকে দুটো স্পিড বোট বাশি বাজাতে বাজাতে এসে আমাদের লঞ্চটিকে দুই দিক থেকে ঘিরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের গতি থেমে গেল।

সমস্ত যাত্রীর ভেতরে একটা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো।

কেউ কেউ বলে বসলো, নিশ্চয়ই আমরা ডাকাতের কবলে পড়েছি। আজ আর রক্ষা নেই। এ রুটে মাঝে মধ্যে লঞ্চ ডাকাতি হয় তা আগে শুনেছিলাম। টাকা-পয়সা, হাতঘড়ি যার কাছে যা ছিল সবাই নিরাপদে রাখার চেষ্টা করলো। লোকজন ভয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করলো।

ডাকাত দলের মারপিটের ভয়ে সবাই অস্থির হয়ে গেল। অবশ্য এর আগে শিক্ষা সফর, বনভোজন, ভ্রমণ ইত্যাদি কাজে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, কুমিল্লা, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করেছি। কিন্তু জীবনে কোনোদিন ডাকাতের কবলে পড়িনি। আজ ভাগ্যে কি আছে আল্লাহ জানে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই লোকজনের মধ্যে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল। কেউ কেউ ক্যাবিনের বাইরে এসে লঞ্চের পেছনের দিকে গেল।

আমিও বের হয়ে দেখি স্পিড বোট দুটি লঞ্চের সঙ্গে ভিড়েছে এবং অনেকগুলো পুলিশ বন্দুক হাতে চারদিকে বসে আছে। একটা স্পিড বোটের মাঝখানে একজন মোটা ভদ্রলোক শাদা পাঞ্জাবি গায়ে বসে আছেন। তার মাথায় চুল না থাকায় চাদের আলোতে দোতলা থেকে টাকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মুহূর্তেই আমাদের আর জানতে বাকি রইলো না যে, মন্ত্রী সিরাজগঞ্জে জনসভা শেষে ঢাকায় ফেরার পথে স্পিড বোটে লোক বেশি হওয়াতে কিছু লোক এই লঞ্চে ফেরত দেয়ার জন্য আমাদের লঞ্চটিকে থামিয়েছেন।

সমস্ত যাত্রীরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

যথাসময়ে পুনরায় লঞ্চ ছেড়ে আমরা অবশ্য নিরাপদে সিরাজগঞ্জ এসে পৌছালাম।

জামতৈল, সিরাজগঞ্জ থেকে

জন্মদিনে

– আয়েশা আক্তার রীতা

জে–কে আমি খুব ভালোবাসি। আমি ক্লাস নাইনে থাকতে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আজ ছয় বছর যাবৎ সম্পর্ক রয়েছে।

জে ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামীণ–এর মোবাইল ফোন কিনেছিল। তাদের ঘরে টিঅ্যান্ডটি–র ল্যান্ড ফোন আছে। কিন্তু তার রুমে সেট নেই। একটি তার আম্মার রুমে, অন্যটি তার বোনের রুমে। তার ফোন এলে এ দুই রুমের একটিতে গিয়ে ধরতে হতো বলে তার আম্মাকে বলে সে মোবাইল ফোন কিনেছিল। তার কথা হলো, মোবাইল থাকলে বন্ধু–বান্ধবদের কাছে মাঝরাতের পরে ফোন করতে পারবে বা বন্ধু–বান্ধবরাও তার কাছে মাঝরাতে প্রয়োজন হলে ফোন করতে পারবে। এখানে ডেকে দেয়ার ঝামেলা নেই।

আমার আব্বা সড়ক ও জনপথ–এ কার্য সহকারী পোস্টে চাকরি করেন। তখন আব্বা মোবাইল কেনেননি। আমাকে মাঝে মধ্যে জে বলতো, তোমার আব্বা যে ঘুস খান, তাতে তো তোমাদের ফ্যামিলির প্রত্যেকের একটা করে মোবাইল থাকা উচিত।

আমি জানি জে মজা করে এসব বলে। কারণ আমার আব্বার ঘুস খাওয়ার সুযোগ থাকলেও ঘুস খান না, এমনকি সাইট–এ গেলে দুপুরের খাবারের জন্য যে টাকা পান সে টাকা দিয়ে বাইরে না খেয়ে মোটর সাইকেল–এ (অফিস থেকে পেয়েছেন) করে বাসায় এসে খেয়ে যান। এবং সে টাকা দিয়ে বিকেলের বাজার করেন। জে জানে না, আমার আব্বা সিঙ্গার থেকে কিস্তিতে রেফ্রিজারেটর ও টিভি কিনেছেন।

আমার আব্বা ২০০৪ সালে কোরবানি ঈদের সময় মোবাইলের সিম কার্ড কিনেছিলেন। এ সময় গ্রামীণ কম্পানির সিম কার্ড–এর দাম কম ছিল এবং এর আগেই আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমকাকা আব্বাকে নকিয়া কম্পানির মোবাইল সেট উপহার দিয়েছিলেন। আব্বা মোবাইল ফোন কেনার আগ পর্যন্ত জে–র সঙ্গে যদি দেখা করতে ইচ্ছে করতো তাহলে ফোন–ফ্যাক্সের দোকান থেকে দশ টাকা করে মিনিট দিয়ে কথা বলতে হতো। অবশ্য আমি এক মিনিট ফোন করলে সে সঙ্গে সঙ্গে সে নাম্বারে রিং করে কথা বলতো।

জে–কে বিভিন্ন উপলক্ষে ক্যাসেট ও বই গিফট করতাম।

সে তখন বলতো, আমি যেন এসব গিফট না করে তাকে যেন মোবাইল কার্ড দিই।

আমি টাকা জমিয়ে তাই করতাম। তিনশ টাকার মোবাইল কার্ড দিতাম।

২৩ জুন আমার জন্ম তারিখ। জে–র সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক হবার পর থেকে প্রতি বছর এই তারিখে আমরা বেড়াতে বেড়িয়েছি। প্রথমবার গিয়েছিলাম মাধবকুণ্ড–তে। গিয়ে দেখেছিলাম ঝরনা বেয়ে অনেক নিচের কুণ্ডতে পানি পড়ছে। এবং সে পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে ঠাণ্ডা পানিতে নৌকা আছে। সেখানে নৌকায় চড়েছিলাম। এর পরের ২৩ জুন আমরা গিয়েছিলাম সিলেটে *ওসমানী পার্ক*–এ। সেখানে লেক–এ নৌকা ভাড়া করে নৌকায় চড়েছিলাম। এর পরের ২৩ জুন আমরা বিখ্যাত *কমলা রানীর দীঘি*–তে নৌকায় চড়েছিলাম। এর পরের ২৩ জুন আমরা আমাদের মনু নদীতে ছইওয়ালা নৌকা করে প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো বেড়িয়েছিলাম।

২০০৩ সালের ২৩ জুন–এর আগে জে কথা দিয়েছিল, এই দিন আমরা মেজর খালেদ–এর ফিশারি–তে নৌকা ভ্রমণ করবো।

আমাদের মনু নদীতে স্লুইস গেট তৈরি করা হয়েছিল। যে দিকে নদী ছিল সেখান থেকে নদী বাম দিকে সরে গেছে। যে জায়গায় গিয়ে নদীটা মরে গেছে সে জায়গায় ফিশারি তৈরি করেছেন মেজর খালেদ। এক মাইলের চেয়ে দীর্ঘ। বাধের আশপাশের গাছের ছায়ায় জোড়ায় জোড়ায় যুবক–যুবতী বসে গল্প করে।

জে আমাকে বলেছিল, আমি যেন ২৩ জুন স্লুইস গেটে থাকি। সে বিকাল ঠিক চারটায় আসবে।

আমি ২৩ জুন চারটার আগে গিয়েছিলাম। পাচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।

কিন্তু জে যায়নি। সন্ধ্যার পর সে রুমার কাছে আমার জন্য গিফট পাঠিয়ে শুভ জন্মদিনে যেতে পারেনি বলে সরি জানিয়েছিল।

এই ঘটনার তিন মাস পর জেনেছিলাম জে সাতার জানে না। শুধু আমি নৌকা চড়তে পছন্দ করি বলে সে আমার সঙ্গে নৌকায় চড়তো। কিন্তু ২০০৩ সালের ২৫ জুন রাতে স্বপ্ন দেখেছিল, সে নৌকা থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে এবং কেউ উদ্ধার করতে আসেনি। তাই সে ২৩ জুন আসতে পারেনি।

তাই ঠিক করেছিলাম ২০০৪ সালের ২৩ জুন আমার জন্মদিনে নৌকা ভ্রমণে না গিয়ে *স্প্রিংস কর্নার*-এ চটপটি-ফুচকা খেয়ে গল্প করে সময় কাটিয়ে দেবো।

এবং ধীরে ধীরে তাকে সাতারটা শেখাবো।

মৌলভীবাজার থেকে

হায়রে পদ্মা

- নিলুফার সুলতানা

অনেক দিন আগে ১৯৫৮-এ হলি ক্রস কলেজে পড়ার সময় বড় ভাইয়ের কাছে থাকতাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ সিলেট বদলি হওয়ায় আমার এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ায় চরম সমস্যা দেখা দিল। আমার বাবা ছিলেন খুব রক্ষণশীল মানুষ। আমার বড় দুলাভাই তখন কুমিল্লার এডিসি। তাই প্রস্তাব দিলেন সেন্টার চেঞ্জ করে পরীক্ষাটা দিতে। কুমিল্লা ভিক্টেরিয়া কলেজের পাশে তার কোয়ার্টার্স।

বড়আপা বলায় আব্বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন। আব্বার কথা, জামাইবাড়ি মেয়ে রেখে পড়াবো না ইত্যাদি। হয়তো তখনই আমার পড়ালেখার ইতি হতো।

আমি দুলাভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ যে, এমএ ও জার্নালিজম পাস করতে তিনি সাহায্য করছেন। বাবার মতো স্নেহ, মমতা দিয়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের গোল্ড মেডাল পাওয়া ছাত্র।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা খুলনা থেকে গাজী ষ্টিমারে চাদপুর হয়ে কুমিল্লার পথে রওনা হলাম। অনেক দিন পর নদী ভ্রমণ, বেশ ভালো লাগছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বাবা! কি বিশাল প্রমত্তা পদ্মা নদী। এপার-ওপার শুধু জলরাশি। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

আমাদের পাশের ক্যাবিন দুটোতে ছিল প্রায় আট নয়জন জাপানিজ ইঞ্জিনিয়ার। কোনো এক কনস্ট্রাকশন কাজে কুমিল্লা যাচ্ছিল। ষ্টিমারের খাওয়া এখনো বেশ মজার। তাই ডেকে বসে খাচ্ছিল। মেঘ-বাতাসের কোনো পাত্তা ছিল না তাদের। বেশ জোরে জোরে বাতাস শুরু হলো। প্রকাণ্ড বড় বড় ঢেউ এতো বড় ষ্টিমারটিকে কাত করে দিচ্ছিল।

আমি ভয়ে শুধু দোয়া পড়ছি আর নিচে তাকিয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল, শুধু পানি এফোড়-ওফোড়। লোকজন উপরে উঠে আসতে লাগলো। হিন্দুরা উলু দিচ্ছে, মুসলমানরা আজান দিচ্ছে। ভয়ে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

এমন সময় চালক এসে দুলাভাইকে বললো, স্যার, আমরা কোনোভাবে আটকাতে পারছি না। ডুবে যাবেই, কি করবো! আপনি পরিবার নিয়ে যাচ্ছেন! এভাবে মৃত্যু হবে, বয়াগুলো খুলে আপনাদের বাচানোর চেষ্টা করি, অনুমতি দেন স্যার।

দুলাভাই বললেন, যদি কোনো খালে ঢুকে পড়তে পারেন সে চেষ্টা করেন। কারণ এতো লোক মৃত্যু পথযাত্রী আর আমরা বাচবো তা হয় না। আমি একজন সরকারি দায়িত্বশীল কর্মচারী হয়ে এ আদেশ দিতে পারি না।

জাপানিজরা এসে দুলাভাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, হে মিস্টার, হোয়াট ইজ গোইং অন?

কারণ সারেং-সুকানিরা বার বার আমাদের ক্যাবিনে আসতে দেখে ভাবছিল দুলাভাই বোধহয় কেউকেটা।

জীবনে যা দোয়া-দরুদ শিখেছিলাম সেদিন শুধু একভাবে পড়েছিলাম। সত্যি সত্যি স্টিমার খালে ঢুকে পড়লে আমরা বেচে যাই। ভোর হলো, ঝড়ও থামলো। আস্তে আস্তে স্টিমার ভেপু বাজিয়ে খাল থেকে আবার পদ্মার বুকে চলতে লাগলো।

পদ্মার সেই ভয়াবহ রূপ আজও ভুলতে পারি না।

কিন্তু কয়েক বছর আগে রাজশাহী গিয়ে পদ্মা নদীর দেখার শখ হয়েছিল। হতবাক হয়ে গেলাম হার্ডিঞ্জ বৃজের নিচে শুধু বালু আর বালু, ইট ভাটা, গরু গাড়ি, মানুষ আরামসে হেটে বেড়াচ্ছে সেই কূল উপচে পড়া পদ্মা নদীতে!

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

সেন্ট মার্টিনস

- মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব

আমার চাকরি ব্যাংকে। ডিসেম্বর মাসে ছুটি পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও ডিজিএম-স্যারকে অনুরোধ করতেই তিনি কোনো আপত্তি করলেন না। সে মোতাবেক ১৯ ডিসেম্বর আমরা কক্সবাজার গেলাম। উঠলাম *হোটেল সি কুইন*-এ। তবে আমার বৌ রিমিকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিইনি আমাদের সেন্ট মার্টিনস যাওয়ার প্ল্যান বিষয়ে। তার সঙ্গে শুধু হিমছড়ি আর বিচে ঘোরার ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম।

২০ তারিখে দুপুর থেকেই খোজখবর শুরু করলাম। প্যাকেজের খরচ একটু বেশি মনে হলো। জনপ্রতি সাড়ে ছয়শ থেকে সাড়ে সাতশ টাকা। তাই পর্যটনে একটু খোজখবর করতেই ওরা বাসে যাওয়ার বুদ্ধি দিল। বাসও সি-ট্রাক ছাড়ার জায়গায় নামিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করলো।

বাসের টিকেট কাটলাম পঞ্চাশ টাকা করে। এরপর *এমভি যাত্রীক*-এর টিকেট কাটলাম দুইশ চল্লিশ টাকা করে। সাকুল্যে পাচশ আশি টাকা খরচ হলো।

পরদিন ২১ তারিখে ভোর ছয়টায় বাসে করে রওনা দিলাম। প্রায় আশি কিলোমিটার জার্নি। কিন্তু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অনেক পথ ঘুরে যেতে হয় বলে সময় লাগে বেশি।

ঘাটে পৌছালাম সকাল নয়টায়। সেখানে পন্টুন ভাড়া দিয়ে রেস্টুরেন্টে নাশতা সেরে নিলাম। তারপর এমভি যাত্রীক-এর দোতলায় গিয়ে সতরঞ্জিতে জায়গা দখল করলাম। এমভি যাত্রীক একটি দ্বিতল লঞ্চ। প্রায় দুইশ লোক ধরে।

প্রথমে দশটার সময় বিআইডাবলিউটিএ-র সি-ট্রাকটি ছেড়ে গেল। সেটাতে দেখলাম মুরগির মতো গাদাগাদি করে মানুষ তোলা হলো। তবে সাড়ে দশটায় মধ্যে আমাদের লঞ্চও ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চাপাচাপি করে তিনটি পরিবার এক সঙ্গে বসলো। বসেই মহিলারা ছেলেদের সঙ্গে কল বৃজ খেলতে বসলো।

রিমি এসব দেখে খুব অবাক হলো। মেয়েরা তাশ খেলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে ছিল।

একটু পরে পৌনে দশটায় লঞ্চ ছাড়লো। এমভি যাত্রীক চলতে শুরু করেছে সেন্ট মার্টিনস-এর উদ্দেশ্যে। আমাদের বামপাশে এক নাদুস নুদুস ফ্যামিলি বসেছে। স্বামী-স্ত্রী আর তাদের দুই ছেলে মেয়ে। স্বামী-স্ত্রী যে রকম মোটা, তাদের ছেলেমেয়েরাও একই হারে স্বাস্থ্যবান। তাকে বললাম যে, এই ফ্যামিলিকে দেখলে তো বিদেশিরা আমাদের অনুদান দেয়া বন্ধ করে দেবে।

শুনে সে হেসেই বাচে না।

তবে বেশিক্ষণ লাগলো না তাদের এই অসাধারণ স্বাস্থ্যের গূঢ় রহস্য বুঝতে। প্লাস্টিকের একটা ঝুড়ি থেকে একে একে বের হলো পরোটা, গোশত আর জুস। তারপর তারা চা খেয়ে পুত্র–কন্যার হাতে তুলে দিল চিপস এবং কোকের ক্যান। একটু পরে বের হলো কলা এবং কমলা।

আমরা দুজন এর মধ্যে খেলাম এক প্যাকেট চিপস আর চা।

লঞ্চের গতি বেড়েই চলেছে। এখনো পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ির চলাচল দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে পাহাড়ের কোলে রাস্তা দেখে মনেই হচ্ছিল না বাংলাদেশের কোনো দৃশ্য দেখছি। নাফ নদীর পাড় ঘেষে বেশ কয়েকটি পাকা বাংলো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সব বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া ঘাটে নৌকা বাধা আছে।

একটু পরে লঞ্চ মোড় ঘুরলো। এবার নদী এতো চওড়া হয়ে গেল যে দুই পাশে আর কূল দেখা যাচ্ছে না। এখন একটু ভয় করতে লাগলো। বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। স্বাস্থ্যবান ফ্যামিলি খাওয়া–দাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। রিমিকে নিয়ে লঞ্চের ডেকে সিড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বাধা পেলাম। জানলাম, একটু পরেই নাকি লঞ্চ সমুদ্রে পড়বে। লঞ্চের ভারসাম্য রাখার জন্য এখন ডেকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। তাই নিচ তলায় নেমে এসে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ঢেউ দেখতে থাকলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম, পানির রঙ সবুজ হয়ে গেছে। বুঝলাম আমরা নদী থেকে সাগরে পড়েছি। মাঝে মধ্যে দুই একটা নৌকা ছাড়া আর কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আমি তাকে নিয়ে এক তলায় সিড়ির কাছে দাড়িয়ে দুই পাশের বিস্তীর্ণ সবুজ জলরাশির বুক চিরে লঞ্চের এগিয়ে যাওয়া দেখতে থাকলাম। হঠাৎ কয়েকটা সামুদ্রিক পাখি চোখে পড়লো। বুঝতে পারলাম দ্বীপ অনেক কাছে চলে এসেছে। একটু খেয়াল করে তাকাতেই দূরে সেন্ট মার্টিনস দেখা গেল। আশ্চর্যের সঙ্গে আরো দেখলাম সবুজ পানি এবং নীল পানির একটা সুস্পষ্ট বিভাজন দেখা যাচ্ছে। আমার কাছে সব স্বপ্নের মতো লাগছিল। এতো দিন টিভি চ্যানলে বিভিন্ন জায়গায় সমুদ্র বা লেগুনের নীল, সবুজ পানি দেখেছি। বাংলাদেশেই যে এই চমৎকার দৃশ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা কে জানতো!

মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌনে একটায় লঞ্চ নোঙ্গর করলো। বিআইডাবলিউটিএ–র সি–ট্রাকটি দেখলাম জেটিতে ভেড়ানো আছে। লঞ্চের তলদেশ ফ্ল্যাট না হওয়ায় আমরা জেটিতে ভিড়তে পারলাম না। বড় কাঠের তক্তা দিয়ে সিড়ির মতো তৈরি করা হয়েছে।

এটা দিয়ে রিমি কিছুতেই নামবে না।

লঞ্চের লোকেরাই তাকে ধরে ধরে নামালো। নামতেই হাটু পর্যন্ত ভিজে গেল।

নেমেই রূপচাদা ফ্রাই আর ভাজি ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে ডাব খেলাম। সেখান থেকে বিচে গিয়ে পানির নিচের প্রবাল পাথরের দিয়ে হাটলাম। সেন্ট মার্টিন প্রায় অর্ধেকটা সমুদ্রের পাড় দিয়ে হেটে এসে জেটি পর্যন্ত এলাম। এরই মধ্যে নীল পানির সান্নিধ্যে আমার পছন্দের মডেল কন্যা রিমির ছবি তুলেছি।

লঞ্চ ছাড়ার কথা দুপুর সাড়ে তিনটায়। লঞ্চে উঠতে গিয়ে বাধলো এক বিপত্তি। ইতিমধ্যে জোয়ার চলে আসায় লঞ্চ থেকে সৈকত–এর দূরত্ব আরো বেড়ে গেছে। ট্রলারে করে গিয়ে ট্রলার থেকে লঞ্চে উঠতে হবে। কিন্তু ঢেউয়ের দাপটে ট্রলার আর লঞ্চ কখনোই একই সমান্তরাল থাকতে চায় না। লঞ্চে ওঠার মুহূর্তে একবার পা ফসকে গেলে ট্রলার ও লঞ্চের মাঝে পড়ে তখনই চ্যাপটা হতে হবে।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লঞ্চে ওঠা গেল।

ফেরার সময় সমুদ্র ভীষণ উত্তাল হয়ে উঠলো। দূরে খুটিতে বাধা জেলে নৌকাগুলো বাদামের খোসার মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে আর নামছে। একেক সময় ঢেউয়ের বিশাল একেকটা ঝাপটা লঞ্চকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সকালে যে নীল পানি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তা দেখে এখন ভয় লাগছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আমরা নাফ নদীতে এসে ঢুকলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলো। রিমিকে নিয়ে এই পড়ন্ত বেলায় ডেকে গেলাম। সুর্যাস্তের মুহূর্তগুলোতে তার ছবি তুললাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নিচে নেমে এলাম।

রিমি আমার গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগলো।

সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় আমরা আবার ঘাটে ফিরলাম।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

নৌকাডুবি

– ওহাব

আমাদের অধিকাংশ ধানী জমি আংশিক জলাপূর্ণ এবং নিম্ন সমতল ওই নদীর ওপার।

সে বছর প্রচুর ধান হলো। নৌকা বোঝাই করে ধান কেটে ভরা হলো নদী পার করার জন্য।

কিন্তু বিধি বাম! নদীর মাঝখানে আসতেই ধানের ভারে নৌকাটি ডুবে গেল।

নানা বললেন, নাতি রে...।

বললাম, কি?

নৌকার অবস্থা তো ভালা না!

কেন, কি হয়েছে?

দেখলি না ডুইব্যা গেল।

কি সব রহস্যময় কথা! বুঝিয়ে বলো।

এইবারের নির্বাচনে দেখিস ধানের শীষেরই বিজয় হইবো।

মনে মনে বললাম, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক নানা। তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

আশ্চর্য!

অবশেষে নানার কথাই সত্যি হলো। ২০০১–এর ১ অক্টোবরের নির্বাচনে চার দলীয় ঐক্যজোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো। অর্থাৎ ধানের ভারে সত্যি সত্যিই নৌকা ডুবে গেল।

সাভার, ঢাকা থেকে

আটলান্টিক

– সাহাব উদ্দিন আহম্মেদ

২২ অক্টোবর ২০০২ সাল। আমরা ইটালির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। প্রথমে আমাদের আনা হয় আফৃকার একটি দেশ মৌরিতানিয়ায়। দালালের সঙ্গে আমাদের কথা ছিল, স্থলপথে স্পেনের দ্বীপে পৌছে দেবে। কিন্তু মৌরিতানিয়ায় দালাল আমাদেরকে মিথ্যা তারিখ দিতে লাগলো এবং ঘোরাতে লাগলো। অবশেষে আমাদেরকে শাহারা মরুভূমির ওপর দিয়ে মরক্কোতে আনলো। এনে আমাদের বললো যে, আমাদের যেখানে ঢোকানোর কথা ছিল সে ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে স্পেনের অন্য দ্বীপে ঢোকাতে হবে। দালাল মনির আমাদেরকে বললো, মাছ ধরার ট্রলার দিয়ে ওই দ্বীপে পৌছাতে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে।

আমরা মোটামুটি সাহস করলাম। প্রথমে আমাকে এবং সাইফুলভাইকে এক সঙ্গে ডাংকি মারানো হলো। আমাদেরকে সাগর পারে আনা হলো। সাগর পারে এসে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। নৌকা এবং সাগরের ঢেউ ও গর্জন শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। পাতলা কাঠের তৈরি ছোট একটি ডিঙি নৌকা। প্রতিটি জোড়ায় বেশ

ফাক। কোনো রকমে রঙ দিয়ে সেই ফাকগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। ভাবলাম, এই নৌকা তো আটলান্টিকের একটি ঢেউয়ের বাড়িও সহ্য করতে পারবে না! যদি ডোবে তাহলে তো নিশ্চিত মরন ছাড়া উপায় নেই।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই পথে যাবো না। আমরা মরক্কোর দালালের কাছে আকুতি-মিনতি করতে লাগলাম। কিন্তু তারা কোনো কথা শোনে না। অবশেষে বুঝতে পারলাম আমরা যেখানে এসেছি এখান থেকে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবনটাকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ, জীবন-মরনের মালিক তুমি। সব তোমারই ইচ্ছা।

যেদিন ঠিক হলো আজ আমরা রওনা দিচ্ছি এতো দিন সবার কথা ঘন ঘন মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়তে লাগলো মা-বাবা, ভাই-বোন ও বৌয়ের কথা। রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলাম। সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। মনে মনে মা-বাবার পা থেকে কদমবুসি নিলাম। চোখের পানিগুলো ঝর ঝর করে পড়তে লাগলো। মনে হচ্ছে আমরা কলেমা পড়তে পড়তে ফাসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

রাত প্রায় বারোটার দিকে নৌকা ছাড়লো। আমরা মোট যাত্রী ছিলাম আটাশজন। আমরা দুজন বাংলাদেশি। বাকিরা আফৃকার। ডিঙির তলায় কাঠ দিয়ে সবাইকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ রকম গাদাগাদি করে বসানো হয়েছে যে, কোনো নড়াচড়া করা যায় না। এদিক দিয়ে ডিঙির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের বাড়িতে পানি আসে এবং সারা শরীর সব সময় ভিজিয়ে রাখে। ডিঙির নিচ দিয়েও পানি ওঠে। একাধারে তিনজনকে পানি ফেলতে হয়। একটু বন্ধ করলেই পানিতে ডিঙি ভরে যাওয়ার অবস্থা। যেহেতু ডিঙিতে বসা ছিলাম, এদিক দিয়ে কোমর পর্যন্ত ভেজা। ফলে ঠাণ্ডা ও শীতে সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু পথও যেন ফুরাচ্ছে না।

সারা রাত চললো। পরের সারা দিনও নৌকা চললো। এদিকে সারাক্ষণ সময় কাটছে আতংকে। কখন যেন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কখন যেন ঝড় উঠে যায়। কখন যেন বড় একটি ঢেউ এসে ডিঙিটা উল্টিয়ে দিয়ে যায়।

রাত দশ এগারোটায় মাঝি বললেন, আমরা পথ ভুল করেছি।

আমাদের মন আরো ভেঙে গেল।

আফৃকার লোকগুলো শুরু করলো চেচামচি।

আরো ভয় লাগতে লাগলো। কখন যে ডিঙির তলা বা কাঠ ছুটে যায়!

ডিঙিটা ঘুরিয়ে আবার অন্যদিকে ছাড়লো। কোথাও কোনো কূল-কিনারার চিহ্ন নেই। তখন হালকা বাতাস বইছিল। সারাক্ষণ আল্লাহর দরবারে দোয়া-কালাম পড়তে থাকলাম। হে আল্লাহ, কি অপরাধ আমরা করেছি! আমরা তো মুসলমান। তোমাকে, তোমার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বাস করি। এখানে মরলে তো আল্লাহ আমাদের জানাজাও হবে না। মাছ, হাঙ্গর আমাদের লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। আল্লাহ, তুমি আমাদের রক্ষা করো। এসব ভাবতে ভাবতে মনে হলো আমি আর নৌকায় নেই। মনে হলো অন্য কোথাও চলে গেছি। জানি না এটা আল্লাহপাকের কোনো রহমত বা আল্লাহর কুদরত কি না!

সারাটা রাত যে কিভাবে কাটলো তা টেরও পেলাম না।

সাইফুলভাই আমাকে ডাকলেন, সাহাব উদ্দিনভাই, দেখেন আমরা এসে গেছি।

চোখ মেলে দেখি সকাল হয়ে গেছে এবং আমরা সত্যিই এসে গেছি। সারাটা রাত যেন দশ মিনিটেই পার হয়ে গেল। আমরা জীবন ফিরে পেলাম। আমাদের মুখে আবার হাসি ফিরে এলো। আমরা ত্রিশ ঘণ্টা আটলান্টিকের ওপর ভেসে অবশেষে স্পেনের দ্বীপ ফরতোভেনতোরায় এসে নামলাম। আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করলাম।

ওই দ্বীপে পয়ত্রিশ দিন থাকার পর মূল স্পেন, ফ্রান্স হয়ে অবশেষে ইটালিতে এসে পৌছেছি মোট ছয় মাস বারোদিন পর।

রোম, ইটালি থেকে

সিনেমার মতো

- রেখা

নৌকা ভ্রমণে যাবো বা নৌকায় চড়ে সারা দিন ঘুরবো এ কথা শুনলে যে কারো, বিশেষ করে যাদের নৌকা ভ্রমণ খুব প্রিয় তাদের মনটা আনন্দে ভরে উঠবে। তারপর সেই নদী যদি হয় শান্ত! তার মাঝ দিয়ে বয়ে যাবে ছোট একটা নৌকা আর মাঝি যাবে গান গেয়ে তার ভাঙা কণ্ঠে।

এমন পরিবেশ যার ভালো লাগে আর এমন হলে কার না নৌকা ভ্রমণে যেতে ইচ্ছে হবে না! আমার নৌকায় চড়তে ভীষণ ভালো লাগে আবার ভয়ও লাগে। নৌকায় উঠলে মনে হয় এই বুঝি নৌকা ডুবে গেল। তারপরও নৌকায় কম বেশি চড়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নৌকা ভ্রমণের ছোট একটা মিষ্টি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল।

দিনটা ছিল ৩ মার্চ ২০০৪ সাল। আমার বান্ধবী তানিয়ার জন্মদিন। তানি কখনো নৌকায় চড়েনি। সে ঠিক করলো নৌকা ভ্রমণে যাবে। সঙ্গে থাকবে আমাদের দুটো বন্ধু ছোলার ডাল ও মুগ ডাল। বলে রাখি আমার বন্ধু দুটোর নাম সোলায়মান ও রাকিব। আমি ডাকি ডাল নামে। তাদের অবশ্য আগে থেকে বলা হয়নি আজ তানির জন্মদিন।

যাই হোক। এক ঘণ্টার জন্য একটা নৌকা ঠিক করলাম। সঙ্গে ছিল আমাদের আরো দুটো বন্ধু মিতা ও লাইজু। মোট ছয়জন নৌকায় উঠলাম। বলে রাখি যে, আমরা যখন নৌকা ভ্রমণে গিয়েছি তখন সময়টা ছিল ঠিক দুপুর বারোটা। নৌকায় উঠলাম, আমাদের নৌকার যিনি মাঝি তিনি ছিলেন একটু বয়স্ক ধরনের। আর নৌকাটা ছিল ছইওয়ালা। তার ভেতরে আমরা বসে আছি। টুকটাক গল্প হচ্ছে, সঙ্গে গানও হচ্ছে।

আমাদের বন্ধু ছোলার ডাল–এর কণ্ঠ খুব সুন্দর। তবে সে কোনা গানই পুরোটা গায় না। হঠাৎ করে সবাই কেন যেন কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে যাই। সেদিন নদীর পানি ছিল শান্ত। তাই হয়তো নদীর পানির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবাই আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক তখনই মাঝি লোকটি বলে উঠলেন, কই বাবাজিরা, মা–ঝিরা গান ধরো, গান।

তখন আমরা বললাম, চাচা, আমরা তো ভালো গান গাইতে পারি না। আপনি না হয় গান ধরুন।

তখন মাঝি শুরু করলেন – *ওরে সাম্পানের নাইয়া আমায় দে না দে ছাড়িয়া, সামাল সামাল সামাল সাথী...* ইত্যাদি আরো কয়েকটা গান।

অবাক দৃষ্টি নিয়ে মাঝিটির দিকে তাকিয়েছিলাম আর আনমনা হয়ে তার গান শুনছিলাম। কারণ নৌকায় বসে আছি ও মাঝি গান গাইছে এমন দৃশ্য শুধু নাটক সিনেমাতেই দেখেছি। এবং দেখে দেখে ভেবেছি, কবে আমি এমন নৌকায় বসে থাকবো ও মাঝি গান গাইবে তার আউলা সুরে। সেটা যে সত্যিই এমন করে বাস্তবে পরিণতি হবে তা ভাবতেই পারিনি!

জোড়াগেট, খুলনা থেকে

R.C.C.রোয়িং. 93.কম

- ডা. আবু মুহাম্মদ শাকুরুল আলম তুষার

আমার ছেলেবেলার বেশ বড় একটা সময় মফস্বল শহরে কেটেছে। এ কারণে গ্রাম ও মফস্বলের জীবন ধারা সম্পর্কে একটা ধারণা আমার আছে।

আব্বু মারা যাবার দুই বছর পর আমরা আমাদের থানা শহরে গিয়ে বাস করতে শুরু করি। আমাদের শাহজাদপুর থানার পাশে দিয়ে করোতোয়া এবং বড়াল নদী বয়ে গেছে। বিকেলে করোতোয়ার বাধানো ধার বেয়ে বেড়ানো আর নৌকা নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদী ভ্রমণ আমার প্রায় প্রতিদিনের কাজের মধ্যে পড়তো। স্কুলের পরীক্ষার পর ছুটিতে খালার বাড়ির পাশের ইছামতি নদীতে খালাতো ভাইদের সঙ্গে সাতার কাটা এবং নৌকা চালানো ওই সময়ের অনাবিল আনন্দের উৎস ছিল।

এভাবে এক সময় যখন ক্লাস সিক্স পাস করে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলাম তখন কার্যত একেবারেই আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমাদের কলেজের পাশ দিয়ে প্রমত্ত পদ্মার উন্মত্ততা তখন না থাকলেও ধীর স্থিতধি কুলকুল শব্দ একাডেমিক ভবন থেকেও শোনা যেতো। কিন্তু এটুকু দূরত্বও তখন আমাদের জন্য দুর্লংঘনীয় ছিল। আমাদের কলেজে হবি ক্লাব সোসাইটি বলে ক্যাডেট ও টিচারদের সমন্বয়ে গড়া সংগঠন ছিল। প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার প্রায় তিন চার ঘণ্টা করে আমরা আমাদের এই সোসাইটির প্রায় ১৮ রকম কার্যক্রমে পালাক্রমে কাজ করতাম। এই সোসাইটিগুলোতে আমরা খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতাম। কেননা এখানে নিজেদের মতো করে কাজ করার অনেক সুযোগ ছিল। এ সোসাইটির কেউ বা ফটোগ্রাফিতে, কেউ কেউ উড অ্যান্ড মেটাল ওয়ার্কসে, কেউ ড্রাইভিংয়ে, কেউ বা মিউজিক অ্যান্ড ড্রামা–তে মজার মজার আইটেমে কাজ করতো।

আমি ক্লাস ইলেভেনে রোয়িং (Rowing) ক্লাবের সদস্য হলাম। এ ক্লাবের কাজ ছিল প্রথম ছয় মাস কলেজের বড় দীঘিতে নৌকা চালানো ট্রেনিং নিয়ে। পরবর্তীকালে পদ্মা নদীতে বিভিন্ন জায়গায় নৌকা নিয়ে ভ্রমণ করা।

প্রথম তিন মাস আমরা বিভিন্ন ক্লাসের প্রায় বারোজন যথানিয়মে প্রশিক্ষকদের কাছে ট্রেনিং নেই। এ ক্লাবের সদস্য হতে ন্যূনতম ক্লাস টেনের ছাত্র হতে হবে। কাজেই সদস্যরা মোটামুটি বড় ক্লাসের হওয়ায় আমাদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া ছিল।

সময়টা ছিল ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাস। শীত তখনো শুরু হয়নি। নদীতে পানি অপেক্ষাকৃত কম। এ কারণে নৌকা চালানোর ঝামেলাও কম। তাই ট্রেইনার নায়েক রউফ সবাইকে বললেন, চলো আমরা আজকেই পদ্মা নদীতে নামবো।

আমাদের তখন মাত্র তিন মাস ট্রেনিং হয়েছে বলে এ সুযোগ আমাদের কাছে এক বিরাট পাওয়া বলেই মনে হলো। তাই আমরা সবাই, বিশেষত আমাদের ক্লাসের সাতজন, আমি আমানত, রানা, নজরুল, ইকবাল, রাফি, হাসান ও অন্য ক্লাসের চারজনসহ মোট এগারোজন মিলে সরঞ্জামাদিসহ রওনা দিলাম। যন্ত্রপাতি ও লাগেজের মধ্যে ছিল সবার জন্য বৈঠা, লাইফ জ্যাকেট, নাশতার প্যাকেট, খাবার পানি, সানকৃম ও অন্য ছোটখাটো যন্ত্রপাতি।

সবাই কাধে লাগজে আর ঘাড়ে করে প্রায় একুশ ফিট লম্বা ও পাচ ফিট চওড়া নৌকা নিয়ে রওনা হলাম। গন্তব্য ছিল কলেজের পল্টুন থেকে রওনা দিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পুলিশ একাডেমির ঘাটে গিয়ে আবার ফিরে আসা।

প্রায় তিনটার দিকে আমরা রওনা দিলাম। রোদের তাপ কম ছিল ও হালকা বাতাস থাকায় আমরা প্রায় এক ঘন্টাই পুলিশ একাডেমির ঘাটে পৌছে গেলাম। ওখানে নাশতা সেরে সাড়ে চারটার দিকে ফিরতি পথ ধরলাম।

ফেরার পথে আমরা একটু ঘুর পথে আসছিলাম। কিছু দূর যাবার পর জুনিয়র ব্যাচের নাঈম কয়েকবার বমি করে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাকে পাটাতনে শুইয়ে দিয়ে আমরা দশজন ও স্টাফ রউফ নৌকা চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমাদের কাছে পানিতে কি যেন পড়লো?

আমরা হতবাক ভাব কাটানোর আগেই রউফ ওস্তাদ বললেন, সবাই পাটাতনে শুয়ে পড়ো। ওপাড় থেকে বিএসএফ গুলি করতে শুরু করেছে? আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, আমরা বোধ হয় ইনডিয়ার সীমানায় চলে এসেছি?

সবার তখন ভয়ংকর অবস্থা। কেউ যেন নিজেকে আর সুস্থির রাখতে পারছিলাম না। আমাদের পাশে প্রায় দশ রাউন্ড গুলি হলো। গুলির শব্দে আমরা একেবারে বেশামাল হয়ে পড়লাম। কয়েকজন তো কান্নাকাটি শুরু করে দিল। এখন কি হবে ভেবে। আমরা যদি বিএসএফ–এর হাতে ধরা পড়ি কিংবা কারো গায়ে যদি গুলি লাগে? কিছুক্ষণ পর আমাদের তীর থেকে ব্ল্যাংক ফায়ারের শব্দ ভেসে এলো।

ওস্তাদ বললেন, বিডিআর ব্ল্যাংক ফায়ার করছে ও শাদা পতাকা দেখাচ্ছে।

আস্তে আস্তে গুলির শব্দ কমে এলো।

আমরা একটু সুস্থির হলে লাউড স্পিকারে বিডিআর ঘোষণা করলো আপনারা ধীরে ধীরে তীরে চলে আসেন। আস্তে আস্তে আসবেন কোনো রকম শব্দ না করে।

আমরা ধীরে ধীরে তীরে চলে এলাম। পুরো কলেজ যেন আমাদের অপেক্ষায় ছিল। তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। আস্তে আস্তে আমরা আমাদের হাউসে ফিরে এলাম।

এক সপ্তাহ পরে আমাদের স্টাফ নায়েক রউফকে বিএসএ–তে ট্রান্সফার করা হলো কর্তব্যে অবহেলার দরুন। আমরাও খামখেয়ালিপনার জন্য কয়েকদিন শাস্তি ভোগ করলাম।

হবি ক্লাব সোসাইটিতে রোয়িং ক্লাবের কার্যক্রম কলেজের দীঘিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। কিন্তু ওই সময়ে যে উৎকণ্ঠা আর আনন্দ আমরা পেয়েছিলাম তা আজও আমাদের শিহরিত করে। নিউ ইয়র্ক প্রবাসী হাসান, আমি ডাক্তার আলম, মেরিনার রাফি, ব্যাংকার রানা, প্রশাসনের নজরুল, ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল এক সঙ্গে হলে কিংবা মেইলে রোয়িং ক্লাবের কথা সব সময় মনে করি।

মিটফোর্ড, ঢাকা থেকে

ভাষণের সত্যতা

- মোহাম্মদ দুলাল হোসেন

সভ্যতার তালে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়। একটা সময় ছিল বহু গভীর রাতে মাঝিরা যখন পাল তুলে নৌকা বাইতো তখন গান গাইতো নিজেকে সজাগ রাখার জন্য, *মাঝি বাইয়া যাও রে অকূল দরিয়ার মাঝে* ইত্যকার বহু গান।

সেই ছেলেবেলায় দেখতাম গুণ টেনে মালবাহী নৌকাগুলো কিভাবে পাট বোঝাই করে, সবজি ইত্যাদি পণ্য বহন করে পৌছাতো আমাদের লোহারপুল বা সূত্রাপুর বাজারে। কতো লঞ্চ বা নৌকায় করে নববধূ–বর চড়ে যেতো নৌপথে।

আজ এই ইঞ্জিনচালিত যুগে তা কি আর সম্ভব! আজ ইঞ্জিনের শব্দে মাঝি গান হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতে হয়তো মাঝিও থাকবে না আধুনিক প্রযুক্তির ফলে।

সেই দিনগুলো আজ কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? নদীমাতৃক এই দেশের জন্য নৌকা ছিল আবশ্যক বস্তু। তাই বঙ্গবন্ধু বেছে নিয়েছিলেন নির্বাচনে তার প্রয়োজনীয় প্রতীক *নৌকা।* তাই হয়তো ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে গানে শোনা যেতো *মুজিব বাইয়া যাও রে...।*

পাকবাহিনীরা প্রায়জনই সাতার জানতো না। তাই মুক্তিযোদ্ধারা অনেক পাকসেনাদের নদীর মাঝপথে ডুবিয়ে মারতো। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সত্যতা প্রকাশ করেছিল আমাদের দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা, *আমরা পানিতে মারবো।*

নিশ্চিতপুর, নারায়ণগঞ্জ থেকে

হৃদয় ভাঙার ঢেউ

- আরিফ মাহমুদ

চার বছর আগে জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমার আমেরিকা আগমন। মানুষ যাকে স্বপ্নের দেশ বলে। কিন্তু জীবনের সিড়ি খুজতে গিয়ে এতোই ব্যস্ত ছিলাম যে, আসলেই এ দেশ স্বপ্নে মোড়া কি না তা বুঝে ওঠার ফুরসৎ হয়নি। আমার একাডেমিক ডিন আমাকে বলেন, আরিফ, হু আর ইউ? আরিফ তুমি কে?

আমি কোনো ভনিতা না করেই বলি, মি. জেমসন, আমি একটি মেশিন।

আমেরিকানরা যেখানে পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করেই হাপিয়ে যায় সেখানে আমি ষাট ঘণ্টা কাজ, ফুলটাইম স্কুল, হোম ওয়ার্ক প্রজেক্ট করে সত্যিই মেশিন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ইমোশন, ভালো লাগা সব কিছু সমুদ্র সৈকতের নুড়ি পাথরের মতো বিশাল ঢেউয়ের নিচে হারিয়ে যাচ্ছিল। যাহোক, দিন সবার সমান যায় না। সুযোগকে তৈরি করে নিতে হয়।

আমার ভেকেশন শুরু হতেই মনস্থির করে ফেললাম। আমাকে বিশাল নীল জলরাশি আর নীলাকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ যান্ত্রিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কিছু দিনের জন্য খোলা আকাশ এবং নীল দরিয়ার পাশে যাবো। সুখকে একান্ত আপন করে মন্থন করবো নিজের মতো করে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ। সাত দিনের মাথায় আমি ও আমার জাপানিজ বন্ধু খাতসুমি আমেরিকান ওয়ে ক্রুজ ভেকেশন-এর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ভিসা এবং মাস্টারকার্ডের সহায়তায় *ডিসনি ওয়ান্ডার* নামের শিপে চড়ে বসলাম। আমার মনে প্রশান্তির ছায়া। আটলান্টিকের পানিকে দু ফাক করে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে আমাদের জাহাজ।

ছয় দিন সাত রাতের ভ্রমণের শুরু।

জাপানিজ চোখ ছোটওয়ালাটা সারাক্ষণ অটো পার্টসের ডেভেলপমেন্ট আর কমপিউটার ব্রেইনের রহস্য নিয়ে ব্যস্ত। আমি বলি, শালা, তুই এসবই যখন করবি তাহলে চারশ পচাত্তর ডলার খরচ করে এখানে এলি কেন?

সে আমার দশ কথার জবাব দেয় মাত্র এক কথায়। বলে, দোস্ত আমার আসার জন্যই আসা। আমেরিকানরা যেদিন হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা ফেলেছে তারপর থেকে আমাদের আর কোনো আবেগ নেই। বোমার প্রতি নেশা নেই। তবে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা আছে।

আমি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে দাড়াই। পুরো শিপটাই আনন্দে নাচছে। এ যেন এক অন্য পৃথিবী। এর সঙ্গে বৃদ্ধ পঙ্গু ইয়াসীন যখন ইসরেলি মিসাইলে মারা যান, মানবতাবাদী আমেরিকানরা ইরাকি বন্দীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় কিংবা নিকোলাস বার্গের ধড় থেকে মাথা আলাদা করা হয়, প্রভৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি চুপচাপ দাড়িয়ে আছি।

এতো দিন পর এ অখণ্ড অবসরে বার বার দেশের কথা মনে পড়ছে। বাঙালি স্মৃতিকাতর জাতি। আমার ফেলে আসা অতীত আমাকে যেন প্রচণ্ড গতিতে ব্ল্যাকহোলের দিকে টানছে। আমার খুব কাছেই দাড়ানো আরেকটি পরিবার। ঊনিশ থেকে বিশ বছর বয়সের এক তরুণী। কথায় কথায় আমাদের আলাপ জমে ওঠে। আমার বিশেষ কোনো গুণ নেই। শুধু একটি মাত্র গুণের জন্য আমি অনেকের প্রিয় হয়েছি। তা হলো, আমি অত্যন্ত মনোযোগী আর মুগ্ধ শ্রোতা হতে পারি।

তারা হচ্ছে ভেনিজুয়েলার নেটিভ। আর বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান মেয়েটি। কিন্তু যে কথা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না সেটাই শুনতে হলো আমাকে মেয়েটির মায়ের মুখ থেকে। বিন্টু-র আর বেশি দিন নেই এ পৃথিবীতে। অন্ধকার খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ক্লান্ত মন নিয়ে আমার রুমে ফিরি। খাতসুমি তার সৃষ্টি নিয়েই ব্যস্ত।

আটলান্টিকের ঢেউ কোথায়, কিভাবে, কাকে আঘাত হানছে এর কোনো খবরই নেই। পরদিন পড়ন্ত বিকেলে কি যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে টেনে এনে সেখানে দাড় করায়! কিছুক্ষণ পর বিন্টু আসে।

আজও একা। হালকা গোলাপি নাইটি পরে। চোখ দুটি উদাসীন। মনে হচ্ছে মা হারা ক্লান্ত পাখি নীড় থেকে ছিটকে পড়েছে। আমাদের আন্তরিকতা বাড়ে। আমেরিকায় এসে যে জিনিসটি আমি সবচেয়ে বেশি জেনেছি তা হলো, আমি নিজে কতো কম জানি। এই ক্রুজে এসে আমার মনে হচ্ছে, এই ভ্রমণ–বিলাসের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি যেন এক মায়াজালে বন্দী হয়ে আছি। মাত্র একটি রাত পর বিন্টুরা চলে যাবে নিউ ইয়র্কে এবং আমরা চলে আসবো আমাদের নিজস্ব গণ্ডিতে আটলান্টার সেই বন্দী নিবাসে।

বিন্টুকে বলি, বিন্টু, তোমার সঙ্গে এ আকস্মিক পরিচয় আমার জীবনে মহা মূল্যবান ধন, সম্পদ, সম্পত্তি হয়ে রইলো।

কিন্তু বিন্টুর কথার তীক্ষ্ণতায় আশ্চর্য না হয়ে পারি না। সে বলে, ধন, সম্পদের মাঝে তো সব সময় দামের বিষয়টি এসে পড়ে। আর সেখানে থেকে লাভ–ক্ষতির দরকষাকষি, তারপর মন কষাকষি শুরু হয়ে বিচ্ছেদ। না বাবা, আমি দুরারোগ্য ব্যাধিও সইতে পারবো। কিন্তু বিচ্ছেদ সইবার ক্ষমতা যিশু আমাকে দেননি।

মনে মনে বলি, বিন্টু, তা তো আমার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। তোমার কি অসাধারণ সহ্য করার ক্ষমতা! মরণ ব্যাধি তোমার শরীরে বাসা বেধেছে। পৃথিবীর সবাই জানে, শুধু তুমিই জানো না। আসলে তুমি আমার সম্পত্তি না, সম্পদও না, ভালোবাসাও না। আমি কোনো কিছুর সঙ্গে তোমার তুলনাও করতে চাই না। কারো মনে নিয়ে খেলা করার মতো কাপুরুষও আমি না।

কারণ আমার মনকে যখন থেকেই বুঝতে শিখেছি ঠিক তখন থেকে খুব ইনোসেন্ট একটি মেয়ে আমার মনে আসন পেতে বসে আছে। পৃথিবী তোমার সঙ্গে বড় বেশি বিট্রে করেছে। আমি তার কি করতে পারি! তোমার গল্পের সঙ্গী হয়েছি, খোলা আকাশের নিচে আটলান্টিকের ওপর এই ক্রুজে তোমার সঙ্গে বিনিদ্র রজনী উপভোগ করছি যদি তোমার মনে এতোটুকু শান্তি আসে। কিন্তু আমার জীবনের নোঙ্গর তো অনেক আগেই বুড়িগঙ্গার তীরে বেধে এসেছি। তাই তোমার সঙ্গে পরিচয়ের এ সমস্ত স্মৃতি আমার জীবনে কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি হয়ে রয়ে গেল।

পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ নিয়ে জাহাজ দাড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর ওপর আকাশ প্রশান্তির ছায়া ফেলেছে। শুধু বিষাদের ছায়া পড়েছে আমার মনের ওপর। বাংলার নিভৃত পল্লির আটপৌরে ঘরের দুঃখের সঙ্গে জীবন ঘষে ঘষে যার চলা সেই আমি আমারই অজান্তে কোন মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছি!

দূর আকাশে তারা ফুটছে একটি দুটি করে। মায়ামির আকাশে পূর্ণিমা চাদ আটলান্টিকের নীল জলে চুপটি করে বসে আছে। রাত নিশি হচ্ছে ক্রমেই। আকাশে তারা। তারায় তারায় ভরে গেছে সমস্ত আকাশ।

বিন্টুর সমস্ত কথাতেই দুঃখের সুর। বলে, আরিফ, আকাশে আকাশে এতো তারা, তারপরও কোনো কোনো তারা খসে পড়ে।

বলি, আকাশের খসে পড়া তারার কথা বাদ দাও, আমার স্মৃতিতে তুমি যে তারা হয়ে থাকলে তা কখনো খসে পড়বে না। আমি কথার মোড় ঘুরাই।

তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি, আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, নীল ড্রেস পরে তুমি এলে, নীলের কি অসাধারণ কম্বিনেশন!

বিন্টু বলে, তুমি সব কিছুতেই নীল দেখলে। কিন্তু আমার কষ্টের রঙ যে নীল তা তো তুমি দেখলে না।

রাত হাটছে শামুকের মতো ভোরের দিকে আর মৃত্যু এগিয়ে আসছে ভোরের হাত ধরে বিন্টুর দিকে। সৃষ্টির কি রহস্য, বিধাতার কি খেলা। কাল যে ভোর হবে সেটা সবাই জানে, কিন্তু কার জীবনে মৃত্যু কিভাবে নেমে আসবে তা কেউ জানে না, কেউ না।

আটলান্টিকের ওপর আমাদের ক্রুজের শেষ লগন ঘনিয়ে এলো। পরদিন খাতসুমিকে হাটসফিল্ড এয়ারপোর্টের দিকে সিঅফ করে কিসের নেশায় জেএফকে এয়ারপোর্টের দিকে পা বাড়ালাম নিজেই জানি না। ফেলে আসা বন্ধুদের দেখার আশায়, নাকি বিন্টুর শেষ বিদায়ের মুখচ্ছবি আরেকবার দেখতে, তা জানি না।

টাইমস স্কোয়ারের পাশে বিন্টুরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিন্টুকে দেখেই তাদের নেটিভ ল্যাংগুয়েজ স্প্যানিশ ভাষায় বলি, বিন্টু গুসতো এন বেরতে। তু এরেস মুই বনিতা (Good to see you again. You are looking so beautiful)। অলিভ গার্ডেনে এক সঙ্গে ডিনার শেষ করে আমরা যখন নিউ ইয়র্কে ফরটি সেকেন্ড স্ট্রীট ধরে হাটছি তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

বিন্টুর মায়ের একান্ত ইচ্ছায় আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পটুয়া বিন্টুর ছবি আকছে ফুটপাথে বসে। মনে মনে বলি, পৃথিবী আর বেশি দিন বিন্টুকে ধরে রাখতে পারবে না। পটুয়া, তুমি তোমার কাগজের ক্যানভাসে, আর আমি আমার হৃদয়ে বিন্টুর প্রতিচ্ছবি চিরদিন ধরে রাখবো।

আমেরিকা থেকে
arifatlanta@yahoo.com

হারউইচ- টু- হ্যামবার্গ

- মোহাম্মদ সরওয়ার

নিয়ামতভাই নব্বই–এর ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির হিসাব বিজ্ঞান ও আই.বি.এ ইন্সটিটিউটের সাবেক শিক্ষক এবং বর্তমানে আমেরিকার সিনসিনাটি অঙ্গরাজ্যে একটি ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট প্রফেসর, আমাকে দেশের বাইরে আসার ব্যাপারে খুব উৎসাহিত করেছিলেন। এটা যেমন সত্য তেমনি লন্ডনের একটি কলেজের প্রসপেক্টাস–এ ছাপানো একটি ছবিও আমাকে ভীষণ খুব প্রভাবিত করেছিল বিদেশে পাড়ি দিতে। বিদেশে আসা অথবা না আসার বিষয়টি ছিল আমার কাছে *হলে হলো, না হলে নাই*–এর মতো সাধারণ। যদিও মনের ভেতরে অজান্তেই বাইরে আসার ইচ্ছাটা কাজ করছিল গোপনে। কেননা একজনকে একদিন বলেছিলাম, তুমি যে দেশে থাকবে, আমি সে দেশে থাকবো না। অনুভূতির এ জটিল মিশ্রণের সময়কালে কলেজের প্রসপেক্টাস–এর অসাধারণ ছবিটি আমাকে করেছিল বিমোহিত।

ছবিটি সি–ক্রুজ–এর। একটি শিপ–এ বিভিন্ন দেশের কিছু ছাত্রছাত্রী বৃটেন থেকে ইওরোপের আরো কয়েকটি দেশ ভ্রমণে যাচ্ছিল। বিশাল শিপের ডেক–এ জড়ো হওয়া নানান দেশি, নানান বর্ণের, নানান ভাষী ছাত্রছাত্রীদেরকে দেখে আমার নিজেকে তাদের সহযাত্রী রূপে ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

যে আমি ছোটবেলা থেকে কখনোই দেশের বাইরে না যাবার সিদ্ধান্তে ছিলাম স্থির এবং ভাবতাম বাংলাদেশের বাইরে কোথাও গেলে একমাত্র মক্কা–মদিনা যাবো হজের উদ্দেশ্যে, যে আমি ইউনিভার্সিটি জীবনেও বাবার কড়া শাসন ও মায়ের মিষ্টি স্নেহে দিন পার করেছি সেই আমিই অবশেষে ২০০১ সালের প্রথম ভোরে সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের বিশাল বোয়িংয়ে উড়াল দিলাম লন্ডনের উদ্দেশ্যে।

তিন দিনের সিংগাপুর অবস্থানকালে এক সন্ধ্যায় এন্ডলেস ফানল্যান্ড *সন্তোশা* আইল্যান্ড সংলগ্ন নদীকূলে উপভোগ করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন দেশটির সূর্য ডোবা, আলো–আধারি দৃশ্য। তখন নদীতে দেখেছি অনেক জাহাজ। কেউ আসছে, কেউ চলে যাচ্ছে এবং কেউ বা স্থির।

অপরূপ স্নিগ্ধ সে সন্ধ্যায় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া ব্যস্তময় সে শিপগুলো আমাকে আরো আন্দোলিত করেছিল গভীর ভালোবাসায়...। ইশ! যদি আমি ওই রকম একটা শিপে বৃটেনের সেই ভিনদেশি ছাত্রছাত্রীদের মতো ভ্রমণে যেতে পারতাম! মনের ভেতরের বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলোকে জমাট করে পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললাম। লন্ডনে এসে প্রথম সুযোগেই নৌ ভ্রমণে যাবো।

বৃটেনে স্টুডেন্ট ভিসায় এলে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা অন্য বড় যে সুবিধাটি পায় তা হলো, খুব সহজেই এবং শস্তায় ইওরোপ ভ্রমণ। স্টুডেন্টদের সাধারণত ইওরোপের যে কোনো দেশ ভ্রমণে যেতে কোনোই

বেগ পেতে হয় না। শুধু প্রয়োজন ইচ্ছা, ভ্রমণের ইচ্ছা এবং পাউন্ড খরচ করতে পারার মতো উদারতা। (সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি : ১ পাউন্ড = ১১০ টাকা)।

নৌ ভ্রমণের অদম্য ইচ্ছার কাছে পাউন্ডের প্রতি ভালোবাসা হার মানলো। পত্রিকায় একটি ভ্রমণ বিজ্ঞপ্তি দেখে ফ্ল্যাটমেট জসিম, বুলবুল আর তাদের বন্ধু হায়দার মিলে ঠিক করলাম শিপে জার্মানির হ্যামবার্গ যাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। বুকিং পেমেন্ট সব কিছুই হয়ে গেল টেলিফোনে। কি সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য সব কিছু। টেলিফোনে ক্রেডিট কার্ড নাম্বার বলে দিলাম এবং বুকিং সম্পন্ন হয়ে গেল। নেই কোনো হ্যাসল, নেই কোনো অপেক্ষার প্রহর গোনা অথবা পোস্ট অফিসের কেরামতিতে চিঠিপত্র হারানোর ভয়।

দুদিনের মধ্যেই আমাদের বুকিং সংক্রান্ত কাগজপত্র হাতে পেয়ে গেলাম। বন্ধু মিজান তখনো আসেনি। ভিসা পেয়েছে মাত্র। মিজানের বুকিংও দেয়া ছিল। বৃটেনে আসার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সেও আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছিল এবং বিষয়টি ছিল রিয়াল এক্সসাইটিং। কারণ বৃটেনে আসার আগেই তার শিপে জার্মানি ভ্রমণ নিশ্চিত হয়েছিল।

১৭ অক্টোবর ২০০১–এ পড়ন্ত এক বিকেলে বৃটেনের পূর্ব উপকূল হারউইচ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। লন্ডন লিভারপুল স্ট্রট স্টেশন থেকে এক ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণে সরাসরি পৌছালাম হারউইচ পোর্টে। ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম ছিল পোর্টের জেটি পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রেনে বসেই সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হলো। চোখে পড়লো ডি.এফ.ডি.এস সিওয়েজ (Seaways)–এর শাদা রঙ–এর বিশাল শিপটি। মনে হলো, আমাদেরকে স্বাগত জানাতেই বুঝি অপেক্ষা করছে। পোর্ট ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি সম্পন্ন হলো অল্পক্ষণেই। সবাই মিলে উঠে গেলাম ভাবনায় বিস্তৃত, অনুভবে আদৃত শিপে। স্টাফদের সহায়তায় নয় তলা শিপের মধ্যে খুজে পেলাম নিজেদের ক্যাবিন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের শিপ ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে এক্সপ্লোর করে নিলাম শিপের এ মাথা–সে মাথা, পাচ তলা থেকে নয় তলা পর্যন্ত। শিপের তৃতীয় এবং চতুর্থ ডেকটি ছিল বাস, ট্রাক, কারসহ বিভিন্ন যানবাহনের জন্য। আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কোনো বাঙালি চোখে পড়লো না। সবাই হয় বৃটিশ অথবা ইওরোপিয়ান।

শিপে ছিল বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট, বার, কাফে, নাইটক্লাব, পাব, ক্যাসিনো, ডান্স অ্যান্ড সিংগিং ফ্লোর, বুফে, শপিং মল, মানি এক্সচেঞ্জ বুরো, সি ভিউ ইনডোর করিডোর ইত্যাদি। এ যেন এক গোটা শহর!

দেশে থাকতে ১৯৯১ সালে একবার লঞ্চে করে গিয়েছিলাম বন্ধু স্বপনের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি বেড়াতে। গিয়েছিলাম দ্বীপজেলা ভোলায় শুধু ছবি তুলতে। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দুই দুবার সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আছে ঝুলিতে। ট্রলারে করে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে যাওয়া আর ফিরে আসার সময়ে পাগলা ঢেউয়ে সলিল সমাধির আশংকার অভিজ্ঞতাও করেছি অর্জন। কিন্তু সেই নদী বা সমুদ্র বাহনগুলো ছিল এই শিপের তুলনায় ডিঙি নৌকা, এর বেশি কিছু নয়।

জার্মানির হ্যামবার্গের উদ্দেশ্যে আমাদের শিপ একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। বৃটেনের ভূভাগ একটু একটু করে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হচ্ছে। মনে হচ্ছিল পরিচিত ভুবন ছেড়ে যাচ্ছি অন্য কোথাও, অচেনা–অদেখা–অজানা কোথাও। তবুও এর মধ্যে ছিল যেন আনন্দ এবং জানার এক অনুভূতি।

এক সময় গ্রেট বৃটেন নামের দ্বীপ দেশটির পুরোটাই চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে। তবে সঙ্গী হয়ে রইলো শিপের সঙ্গে সঙ্গে উপকূল থেকে এগিয়ে আসা গাংচিলগুলো। এরাও কি আমাদের সঙ্গে হ্যামবার্গ যাবে? দ্বীপ দেশ বৃটেন চোখের আড়ালে চলে গেলেও আমাদের মোবাইলে তখনো পূর্ণ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। দেখলাম শিপের সঙ্গেই নেটওয়ার্ক টাওয়ার। মাঝ সমুদ্র থেকে লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে বেশ মজা পেলাম।

সেই কখন থেকে জাহাজের ডেকেই ঘুরছি–ফিরছি আর সমুদ্র দেখছি। আমাদের আশপাশের শাদা চামড়ার মানুষগুলোও আমাদের মতোই একই অনুভূতি নিয়ে দিগন্তের পানে চেয়ে আছে। গায়ের রঙ মানুষের যাই

থাকুক, মনের একান্ত ভাবনা এবং গতি-প্রকৃতি বোধ হয় পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষের একই। মাঝে মধ্যে চোখে চোখ পড়লে *হাই, হ্যালো* হচ্ছে বিদেশি এই ভ্রমণ সঙ্গীদের সঙ্গে। এ হলো বৃটেনের খুব কমন কালচার। কারো চোখে চোখ পড়লে লেডিস অথবা জেন্টলম্যান, ইয়াং অথবা সিনিয়র যাই হোক না কেন, হাই, হ্যালো না বলা এবং একটা মৃদু হাসি না দেয়া এখানে খুব অভদ্রতা।

তবে পথ চলতে গিয়ে আমাদের দেশে কোনো সুন্দরী তরুণীকে দেখে আবার এ কাজটি করা উচিত হবে না। কোনো ইয়াং মেয়েকে দেখে হাই, হ্যালো বলে নিজের জীবনটা রিস্কি করার কোনো মানেই হয় না। একান্ত বলতেই যদি ইচ্ছা করে তবে বৃটেনে আসতে হবে।

সূর্য ক্রমেই হেলে পড়ছিল পশ্চিম গগনে। তাই হঠাৎ বয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস ডেকের পরিবেশকে একটু জটিল করে তুলেছে। সেই কখন থেকে ডেকে ঘোরাঘুরি করছি। এখন আকাশ, সমুদ্র দিগন্ত, মাঝে মধ্যে অন্য দুই একটি শিপ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। নর্থ সি (North Sea)-র দক্ষিণ দিক দিয়ে যাচ্ছি আমরা পূর্ব অর্থাৎ জার্মানির হ্যামবার্গ শহরের দিকে।

পাচ বন্ধু মিলে সি-ভিউ করিডোরের ইজিচেয়ারে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলাম গরম কফির সঙ্গে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় ডেক এবং ছাদে জটলা করা যাত্রীরা সব আস্তে আস্তে শিপের ভেতরে চলে এলো। কফি হাউস, শপিং সেন্টার এবং বারগুলো জমজমাট হয়ে গেল। আমরা একটু শপিং সেন্টার ঘুরে দেখলাম। গল্প এবং আড্ডায় অনেক রাত হয়ে গেল। যার যার ক্যাবিনে গেলাম ঘুমাতে। জাহাজ চলতে লাগলো নর্থ সি-র ঠাণ্ডা পানি কাটিয়ে। দিনের সেই মানুষের কোলাহল এখন আর নেই। রাতে শুধু জাহাজ চলার শব্দ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবারও সূর্যের উদয়। চারদিকে সমুদ্র, পানি আর পানির ভুবন। আকাশে দীপ্তিময় সূর্যটাকে পেয়ে সমুদ্রের পানিও যেন ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠছে। কোলাহলময় আরেকটি দিনের সূচনা। নাশতা সেরে আবারও আমাদের ডেকে অবস্থান। সমুদ্র দেখার আনন্দই বোধ হয় ভিন্ন। আকাশ, পানি এবং ঝকমকে আলোর স্বর্গরাজ্যে চলতে চলতে ঠিক দুপুরবেলা দেখা গেল আমরা সমুদ্র ছেড়ে নদীতে চলে এসেছি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নদীর দুই ধার। অসংখ্য ভবন এবং বিভিন্ন ধাতব কাঠামো। অল্প বিস্তর মানুষের আনাগোনা। লৌহ শিল্পে জার্মানি বিশ্বের সেরা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধে পরাজয়ের পর নতুন করে দেশ গড়ার শপথ এদেরকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে অনেক সামনে। নদীর তীরে অসংখ্য শিল্প কারখানা তার প্রমাণ।

বেলা একটায় হ্যামব্যার্গ পোর্টে নোঙ্গর করলাম। এখানেও খুব শর্টকাট ইমিগ্রেশন ফর্মালিটি সম্পন্ন হওয়ার পর আমাদের জন্য অদূরে অপেক্ষমাণ শিপ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত বাসে গিয়ে উঠলাম হ্যামবার্গ শহর ঘুরে দেখার জন্য। মিষ্টিভাষী, কৌতুকপ্রিয় চমৎকার একজন গাইড ইংরেজিতে আমাদেরকে হ্যামবার্গ শহরের বিভিন্ন এলাকা, ভবন এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা দিলেন। অতি অভিজাত এলাকায় একটি ছোট কিন্তু চমৎকার মসজিদও দৃষ্টিগোচর হলো। মসজিদটি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা দিলেন গাইড। ঘণ্টা দুয়েক শহর প্রদক্ষিণ শেষে আমাদের বাস আবার ফিরে এলো পোর্টে। বৃটিশরা তাদের ভিক্টোরিয়ান ঐতিহ্য ধরে রাখায় লন্ডনে প্রাচীনতার ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু জার্মানির হ্যামবার্গ বেশ নতুন ও আধুনিক মনে হলো আমার কাছে।

আবারও ইমিগ্রেশন এবং লন্ডনে ফিরে আসা। বেলা সাড়ে চারটায় ফের বৃটেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সবাই হালকা শপিং করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অন্যরা চকোলেট এবং এ রকম অন্যান্য প্রডাক্ট। আমি আমার ভাগ্নে-ভাগ্নির জন্য কিছু সুভেনির আইটেম কিনলাম। মজার ব্যাপার হলো, বিচ্ছিন্ন এই পানির রাজ্যেও আমরা পেমেন্ট করেছিলাম ক্রেডিট কার্ডে! টেকনলজি আজ কোথায় গিয়ে পৌছেছে। এর শেষই বা কোথায়!

আবারও সেই সন্ধ্যা। সবাই গেলাম গান শুনতে। জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিজেদের সার্বক্ষণিক শিল্পী থাকে। এদের কয়েকজন চমৎকার গান গাইলো। বেশ কয়েকজন বয়স্ক যুগল নাচলো গানের সময়। আমার ধারণা, এরাও এ জাহাজেই চাকরি করেন। পৃথিবীতে কতো বিচিত্র পেশা! সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের সমবেত জার্মান এবং ইংলিশ সঙ্গীতে। আমাদের দেশে যেমন মাঝিমাল্লার নিজস্ব হৃদয়গ্রাহী গান

আছে তেমনি ধরনের গান এরাও গাইলো। বুঝলাম এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং বাহ্যিকতার অনেক ব্যবধান থাকলেও মৌলিক বিষয়গুলোর ধরন জগতের সকল মানুষের একই।

বেশ কিছুক্ষণ গান শোনার পর আমার আর ভালো লাগছিল না। কিন্তু কেন? আমার কি অনামিকার কথা মনে পড়েছিল? শিপের ভেতরের সি-থ্রু করিডোরে এখন কেউ নেই, আমি একা বসে আছি। ভাবছি তার কথা যে আজ এখানে আমার সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কিন্তু নেই। যার কারণে আমি আজও একা! আচ্ছা, অনামিকা কি এখন কারো বুকে মাথা রেখে, দীর্ঘশ্বাস হাসি দিয়ে ঢেকে, নিরাপত্তার উষ্ণতা দিয়ে ঢাকছে যন্ত্রণা?

না, এসব ভেবে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই নৌ ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট করতে চাই না। অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু অন্য ভাবনাও তো আসছে না। রাতের এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে সমুদ্রের কোলে একাকী নিঃশব্দ-নিঃসঙ্গ বয়ে চলা এই জাহাজটির মতো আমিও যে ভীষণ নিঃসঙ্গ! একাকী পাড়ি দিচ্ছি সময়ের স্রোত।

বৃক্সটন, লন্ডন থেকে
saroar@saroar.com

সি- সিকনেস

- মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে দীর্ঘ বারো বছর চাকরি করার সুবাদে জাহাজি জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার রয়েছে আমার জীবনে। এর মধ্যে যেমন আছে আনন্দ ও রোমাঞ্চকর ঘটনা তেমন আছে বেদনা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা।

যে সমুদ্রের বিশালতা, রূপ সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়, সৌন্দর্য পিপাসুরা ছুটে যায় সুনীল জলরাশির পাশে, এর যে অন্য আরেকটি রূপ আছে তা অনেকেরই অজানা।

জীবনের প্রথম সমুদ্রে যাই ডিসেম্বর মাসে। শান্ত-স্নিগ্ধ বিশাল জলরাশি, উপরে নীল আকাশ। যেদিকে তাকাই নীল পানি, তার মধ্যে শাদা শাদা তরঙ্গ, সূর্যের আলো, জ্যোৎস্না রাতে রূপালি স্নিগ্ধতা, অন্ধকারে ঢেউয়ের সঙ্গে আলোর বিচ্ছুরণ। সে এক মোহনীয় পরিবেশ।

এভাবে ছয় মাস কাটলো। এলো জুন-জুলাই মাস। তখনো দেখা হয়নি সাগরের অন্য রূপের। যথানিয়মে জাহাজে সমুদ্র যাত্রা। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পতেঙ্গা আউটার অ্যাংকরেজ পার হতে না হতেই জাহাজ দুলতে শুরু করলো। প্রবল বাতাস এবং প্রকাণ্ড সব ঢেউ জাহাজকে কলা গাছের ভেলার মতো দোলাতে লাগলো। সেই সঙ্গে আমারও মাথা ঘোরা ও বমির উদ্রেক। সহকর্মীদের অনেকেই ইতিমধ্যে বমি শুরু করেছে। জানলাম এটাই সি-সিকনেস বা সমুদ্র পীড়া। সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া আর ঢেউ মিলে জাহাজের দুলনি থেকে সি-সিকনেস হয়। যার সঙ্গে নাবিকেরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। এ এমনই এক অবস্থা যা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। আজ আমি সি-সিকনেস নিয়ে দুটি অভিজ্ঞতার কথা লিখবো।

তখন বড় যুদ্ধ জাহাজ ফৃগেট-এ চাকরি করি। অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়েছি মহড়ার জন্য। সেদিন ছিল উত্তাল সমুদ্র। আমারও বেহাল অবস্থা। এর মধ্যেও কর্তব্যে অবহেলা নেই। প্রায় তিন দিন ভাতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ফল ও ঠাণ্ডা পেপসি খেয়ে কোনো রকম নিজেকে সচল রাখছি। রুটিন মোতাবেক শুরু হয়েছে রিপ্লেনিশমেন্ট (সমুদ্রে চলন্ত অবস্থায় এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে মানুষ বা রসদ সরঞ্জামাদি পারাপারের কৌশল) মহড়া। পরিষ্কার আকাশ, আলোক উজ্জ্বল দিন, সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস ও ঢেউ। ভয়ংকর কিন্তু সুন্দর সে দৃশ্য! আপার ডেকে দাড়িয়ে আছি বাতাসে। মাথা ঘুরছে, বমি ভাব ও দুর্বলতা। হঠাৎ আমার মাথা ও শরীরে বৃষ্টির মতো কি যেন পড়তে লাগলো। হাত দিয়ে দেখি ভাত, মাংস ও তরকারির টুকরায় পুরো শরীর ঢেকে

গিয়েছে। অর্থাৎ আমার ঠিক উপরে বৃজ ডেক থেকে কে যেন বমি করেছে। তা বাতাসে উড়ে এসে আমার এ হাল।

পেটে কিছু রাখা সম্ভব হলো না। বমি করে দিলাম। দৌড়ে নিজে বাথরুমে গিয়ে দেখি, একফোটা মিঠা পানির সাপ্লাই নেই। চারদিকে ছড়ানো জায়গায় জায়গায় বমির স্তূপ। মেসে গিয়ে সব কাপড় ছাড়লাম। জগে সামান্য খাবার পানি নিয়ে মুছে মুছে গা ও মাথা পরিষ্কার করলাম। এরপর পুরো শরীরে সুগন্ধি ট্যালকম পাউডার মেখে নতুন ইউনিফর্ম পরলাম। কিন্তু পাউডারের সুগন্ধকে ছাড়িয়ে নাকে এসে লাগছিল অন্যের বমির দুর্গন্ধ। তাই বার বার বমি করছিলাম। যদিও পেটে তখন একটা দানাপানি ছিল না।

এবার অন্য রকম। ছোট গানবোটে চাকরি করি। যৌথ মহড়ার জন্য খুলনা থেকে সমুদ্রে গমন। উত্তাল সমুদ্র, নৌ মহড়ার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং যথানিয়মে সি-সিকনেস। ইতিমধ্যে জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মহড়ায় অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। আদেশ হলো, চট্টগ্রাম গিয়ে ত্রুটি মেরামত শেষে মহড়ায় ফেরত আসতে হবে।

রাতে নিয়মিত ডিউটি শেষে ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুয়েছি। খাওয়ার কোনো রুচি নেই। কখন সকাল হয়েছে জানি না। শব্দ ও ঢেউ মিলে মনে হচ্ছে জাহাজ রাতের মতো দুলছে। বন্ধু মিজানের ডাকাডাকিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরের ডেকে গেলাম। কি আশ্চর্য! কোথায় সেই উত্তাল সমুদ্র? স্নিগ্ধ, মৃদু বাতাসে ভরপুর নীল পানির এক শান্ত পুকুর যেন! সেই শান্ত সমুদ্রে কয়েকশ ডলফিনের এক ঝাক পানি আলোড়ন করে জাহাজের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে। কখনো লাফিয়ে, কখনো ডিগবাজি খেয়ে, নাক দিয়ে পানি স্প্রে করে, কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করে জাহাজের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

মুহূর্তে ভুলে গেলাম সকল দুর্বলতা, সি-সিকনেস। অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম ডলফিন দলের খেলা।

রাজ্যের ক্ষিধে এসে ভর করলো শরীরে। পেট পুরে খিচুড়ি ও ভুনা মাংস খেলাম। ডলফিন দল তাদের নির্দিষ্ট সীমানায় পৌছে আর সামনে এগোলো না। লাফালাফি করে আমাদেরকে বিদায় জানালো। আমরা চট্টগ্রামের দিকে এবং ডলফিনরা তাদের ঠিকানায় বিপরীত দিকে আস্তে আস্তে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আল্লাহর কাছে অসংখ্যবার শুকরিয়া আদায় করলাম, এমন একটা দুর্লভ দৃশ্য দুই চোখে দেখার সৌভাগ্য দেয়ার জন্য।

হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে

সার্থক

- আবদুর রহিম

ঘটনাটি অনেক আগের। তখন খুলনা মডেল স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। খুলনার অদূরে নন্দনপুরে কিছু জমি কিনেছেন আমাদের এক মামা। তিনি একদিন আমাদেরকে সেই জমির কি হাল-চাল দেখে আসার জন্য বললেন।

আমরা চার বন্ধু – আমি রহিম, বাবুল, লতিফ এবং রফিক মিলে খুলনা জেলাখানা ঘাট থেকে একটি নৌকা রিজার্ভ করে পথের বাজার নামলাম। বেশ কিছুক্ষণ জমির আশপাশে ঘোরাফেরা করলাম এবং ওখানে কিছু সময় কাটালাম। এবার ফেরার পালা। আবার পথের বাজার এসে ছোট একটি নৌকা রিজার্ভ করলাম আসবো খুলনা জেলখানা ঘাট।

আমাদের সঙ্গে যোগ হলো আরো আড়াইজন। আড়াইজন এ কারণেই বলছি যে, এবার আমাদের সহযাত্রী হলো একজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং মহিলার সঙ্গে তিন চার বছরের তার ছেলে। যদিও নৌকা আমরা চার বন্ধুই রিজার্ভ করেছি তবুও এরা অনুরোধ করে আমাদের সঙ্গেই নৌকায় উঠলেন।

আমরা চার বন্ধু বেশ বাদরামি করছি। ইচ্ছা করেই নৌকা দোলাচ্ছি। নৌকা হেলছে–দুলছে, আমরা বেশ মজাও পাচ্ছি।

এরই মধ্যে মহিলা বললেন, ভাই, আপনারা যে এ রকম করছেন, নৌকা ডুবে গেলে তো আপনারা সবাই সাতরিয়ে উপরে উঠে বেচে যাবেন। মাঝখান থেকে আমার বাচ্চাটা মারা যাবে।

আমরা এক বাক্য চিৎকার করে বললাম, নৌকা ডুবলে আমরা মরলেও তোমার বাচ্চাকে ঠিক বাচাবো ইনশাআল্লাহ।

নৌকা আসতে আসতে প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলে এসেছি। এরই মধ্যে তাকিয়ে দেখি মোংলার ওই দিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে নেভির একটি বড় গানবোট এগিয়ে আসছে। দেখে আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ গানবোটের প্রচণ্ড ঢেউ হয়।

মাঝিকে বললাম, মাঝি, খুব সাবধানে হাল ধরো।

মাঝিও আমাদের সবাই সাবধান করে দিয়ে বললো, আপনারা যে যেখানে আছেন, একটুও নড়াচড়া করবেন না।

আমরা মুহূর্তের মধ্যে মূর্তি হয়ে গেলাম। কোনো নড়াচড়া নেই। এরই মধ্যে মহিলা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন।

আমাদের খুব কাছ ঘেষে গানবোটটি দ্রুত গতিতে চলে গেল। কিন্তু গানবোট গেলেও গানবোটের পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে গেল আমাদের নৌকাটি। মাঝি আর ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারলো না। ফলে নৌকা ওখানেই ডুবে গেল।

মহিলা বাচ্চা ফেলেই সাতার দিলেন। অনেকটা *চাচা আপনা জান বাচা।*

আমরা চার বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে চারজনের বাম হাতের উপর রেখে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। কিন্তু বাচ্চার গায়ে পানিই লাগতে দিচ্ছি না।

এরই মধ্যে অন্যান্য নৌকা এসে ওই মহিলা এবং আমাদেরকে ওপরে তুললো। অবশ্য বাচ্চাকে বাচাতে গিয়ে আমরা আমরাও বড় বার্জের প্রায় তলায় চলে যাচ্ছিলাম।

আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সবাই বেচে গেছি। মহিলা উপরে উঠেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন বলা হলো তোমার বাচ্চা বেচে আছে, মহিলা আস্তে আস্তে চোখ খুলে বাচ্চার দিক তাকালেন এবং বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। আমাদের চার বন্ধুকে মহিলা খুব দোয়া করলেন।

মহিলার তৃপ্তি দেখে মনে হলো আমরা বোধ হয় বিশ্ব জয় করেছি।

আমাদের সঙ্গে অন্য যে পুরুষটি ছিলেন তিনি নাকি দিগম্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাতে তার কোনো লজ্জা নেই, বরং বেচে গেছে এতেই তিনি মহাখুশি।

আমাদের অবশ্য দিগম্বর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ আমরা চারজনই প্যান্ট পরা ছিলাম। মহিলার সেদিনের ওই তৃপ্তি দেখে মনে হয়েছিল বিপদে পড়লেও আমাদের সেদিনের নৌকায় চড়া সার্থক হয়েছে।

জীবিকার সন্ধানে আজ আমাদের সেই চার বন্ধুর বর্তমান অবস্থান হচ্ছে – আমি রহিম সউদি, লতিফ পাকিস্তান, রফিক আমেরিকা এবং বাবুল বাংলাদেশে। আমাদের সেই মামার তিন নাম্বার মেয়েটিই বর্তমানে আমার আদর্শ গৃহিণী এবং একটি পুত্র সন্তানের গর্বিত জননী।

সউদি আরব থেকে

কবে

– মোতাহার

দীর্ঘ ঊনত্রিশ মাস প্রবাসের নিদারুণ কষ্টকর জীবন শেষ করে এ বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি ফিরে যাই সবুজ–শ্যামল দেশ আমার প্রিয় বাংলাদেশে। প্রিয় মাতৃভূমির ধূলিবালিসহ সব কিছুই বড়ই আপন মনে হয়। বাসার সবার আগ্রহে ৩ মার্চ আমার বিয়েটাও সেরে ফেললাম।

বৌ নিয়ে বড়আপার বাড়ি যাচ্ছি। বড়আপার বাড়ি রাউজানের উরকিরচর গ্রামে। জল ও স্থলপথ দুভাবেই আপার বাড়ি যাওয়া যায়। আমরা নদীপথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আগের মতো নদী এখন আর নিরিবিলি নয়। আগে মাঝিরা দাড় বাইতো। দাড় বাইতে গিয়ে *কে কুরত, কে কুরত* করে শব্দ আসতো। সে শব্দে এতোটা ভালো লাগতো। যা মনে পড়লে আজও শিহরিত হই।

আজকাল নৌকায় লেগেছে ইঞ্জিন। সে ইঞ্জিনের বিকট শব্দে নদীর শান্ত পরিবেশ আর শান্ত নেই। বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে আবার বৌটির পাশে বসতে পারিনি। কিন্তু আসার পথে তার অনেক কাছাকাছি বসলাম। সে এক অদ্ভুত ভালো লাগা। আমার সঙ্গে ভাবী এবং বোনরা থাকায় আমার বৌ তানীর সঙ্গে খুনসুটি করতে পারছিলাম না। কিন্তু নীরবে–নিভৃতে চোখাচোখিতে বলে ফেলেছি অনেক কথা। মনের অজান্তেই গান চলে এলো – *ও নদী রে একটি কথা শুধাই তোমারে*।

বৌটি আমার হাসছিল।

তার হাসি নদীর ওই নীরব জলের মতোই অপূর্ব লাগছিল।

জীবনে অনেকবার নদীপথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু বৌয়ের সঙ্গে সেদিনের সে নৌকা ভ্রমণ সে রকমভাবে ভালো লাগেনি আর কোনোদিন।

হানিমুনে রাঙ্গামাটি গেলাম। লেকের কাছাকাছি পর্যটনের *নিরালা কটেজ*–এ উঠলাম। লেকের ধারেই পর্যটকদের জন্য সুসজ্জিত সব নৌকা তৈরি লেক ভ্রমণের জন্য।

নদী আর নতুন বৌ মিলে নৌকা ভ্রমণের লোভ আর সামলাতে পারলাম না। নৌকায় পাশাপাশি আমরা দুজন। হাতে হাত ধরে বসে প্রকৃতির অপরূপা সৌন্দর্য দেখছি।

মাঝে মধ্যে বৌটি আমার হাসছিল খিলখিলিয়ে।

আমার বৌটির হাসি লেকের জলের মতোই স্বচ্ছ। রাঙ্গামাটির লেকের দুই ধারে সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে আমাদের নৌকা চলছে। বৌটির গালে এসে পড়ছিল পড়ন্ত সূর্যের আলো। সে আলোয় ঝিলিক মেরে উঠছিল আমার নবপরিণতা বৌটির সমস্ত মুখ।

সন্ধ্যার আগে আগে আমাদের ফিরতে হলো স্থানীয় বিধি নিষেধের জন্য। কিন্তু মন চাইছিল – আরো কিছুক্ষণ লেকের পানিতে নৌকায় ঘুরে বেড়াই।

এক ১০ তারিখে দেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলাম, আরেক ১০ তারিখে এ বছরের মে মাসে আবার দেশের সকল ভালোবাসা উপেক্ষা করে উড়াল দিতে হলো। শুধু স্ত্রীর সঙ্গে নৌভ্রমণ নয়, এ রকম হাজারো স্মৃতিকে বুকে নিয়ে পুণ্য ভূমি চট্টগ্রাম থেকে উড়াল দিলাম। বিমান থেকে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের সেই অনাবিল দৃশ্য দেখে মনটা আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লো। এই চমৎকার শহরে আমার স্ত্রীর একাকী প্রহর কিভাবে কাটবে এটা ভেবেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

দেশের নিদারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য আমাদের মতো হাজারো মানুষকে আজ প্রবাসের কষ্টকর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। দেশে আমাদের প্রিয় স্বজনরা শুধু নৌ ভ্রমণ নয়, এ রকম অনেক আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে।

জানি না কবে এ দুঃখময় জীবনের অবসান হবে!

দোহা, কাতার থেকে

সর্বশ্রেষ্ঠ

– মোহাম্মদ আলমগীর লাবু

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। সারা দেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী, সঙ্গে দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর। ফলে নদীপথ বা সমুদ্রপথ যে পথই হোক না কেন, নৌ ভ্রমণ করেনি এমন মানুষ খুজে পাওয়া খুব দুষ্কর। এই নৌ যাত্রায় আছে যেমন আনন্দ তেমন বেদনা–দুঃখ, আছে নতুনত্ব, আছে শিক্ষার উপকরণ, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন তিক্ততা। কেউ হয়তো ভুলে যায়, কেউ হয়তো তা মনে রাখে। আবার কোনোটা একটা ইতিহাস।

তেমন এক নৌযাত্রা বা নৌ ভ্রমণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছিল। জাহাজটির নাম ছিল *হিজবুল বাহার।* সারা দেশের স্কুল–কলেজ ও ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ডেকে আনা হয়েছিল এই সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য। আর তার অবস্থান, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলতে পারি, সেই নৌ অভিযানটি ছিল আমার বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ ভ্রমণ।

তার আয়োজক হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। যখন এই ভ্রমণ বা নৌ যাত্রার আয়োজন করা হয় তখন আমি হয়তো সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু। কিন্তু সেই সফর সম্পর্কে আল মাহমুদের একটি ভ্রমণ গল্প পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। সেটা নিছক কোনো আনন্দ ভ্রমণ বা পিকনিক ছিল না, বরং তা ছিল বাংলাদেশকে তার আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং তাদেরকে আগামী দিনের সফল নেতৃত্ব দেয়ার মূল মন্ত্রণা। তার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা সফলভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন জিয়াউর রহমান।

এখন বলতে পারি কেন এই নৌযাত্রাটি সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ ভ্রমণ ছিল। কারণ –

এক. এই প্রথম এই নৌ ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যা রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ।

দুই. সেই জাহাজটি যার নাম হিজবুল বাহার, যা আগে হজযাত্রী বহন করতো। এমন একটি পবিত্র বাহনকে প্রেসিডেন্ট জিয়া ভ্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

তিন. প্রথমে সেই ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলা বোধের শিক্ষা দেয়া হয়। বিরাট হলরুমে তাদের সিনিয়রিটি অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আসন গ্রহণ করতে হয়।

চার. বাংলাদেশের জলসীমায় আড়াইশ মাইল তাদের ঘুরিয়ে দেখানো হয়। এবং এই জলসীমায় তাদের মধ্যে সাহস, উদ্যম ও উদারতা সৃষ্টি করার প্রয়াস নেয়া হয়।

পাচ. এই ভ্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো রাষ্ট্রপতি জিয়ার বক্তব্য। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং আগামী কর্মপন্থা নিয়ে দেয়া তার এই বক্তব্য বাংলাদেশি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন দূরদর্শী ও হার্ড হোমওয়ার্কার না হলে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন না। তার এই বক্তব্যের কারণে এই যাত্রাটি হয়ে উঠেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ বা নৌ ভ্রমণ হিসেবে। সেদিন সেই নৌ যাত্রায় জিয়াউর রহমান বলেছিলেন–

এক. সমুদ্র হলো অন্তহীন পানির বিস্তার ও উদ্দাম বাতাসের লীলা ক্ষেত্র। এখানে এলে মানুষের হৃদয় একই সঙ্গে উদার ও সাহসী হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে তোমার ও আমার, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতাকে পরিহার করে সমুদ্রের মতো উদার এবং ঝড়ো হাওয়ার মতো সাহসী হতে হবে।

দুই. এক ঐতিহাসিক তাগিদের জন্য এই পরিবেশে তোমাদের নিয়ে আসা। এ সাগরেই রয়েছে দশ কোটি মানুষের প্রয়োজনের অধিক আহার্য। এই সাগরে রয়েছে বিশাল ভূমি বা দ্বীপ দেশ যা আগামী দুই তিনটি প্রজন্মে জেগে উঠবে। সত্যি সত্যিই বঙ্গোপসাগরে সেই জমি বর্তমানে জেগে উঠেছে। সত্যি অসাধারণ ইএসপি ক্ষমতা ছিল তার। তার সংকল্প ছিল, আমাদের ক্ষিধে ও দারিদ্রকে জয় করতে হবে।

তিন. দশ কোটি মানুষ এক থাকলে এই ভূমি ও সমুদ্রে কেউ আসতে পারবে না, দখল করতে পারবে না।

চার. আমাদের জলসীমাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

পাচ. শোনো, ছেলেমেয়েরাও তোমাদের ওপর ভর করে আছে তোমার দরিদ্র পিতা–মাতাসহ সমস্ত দেশবাসী। তোমারই হলে হাজার বছরের পরাধীনতার কলংক মোচনকারী, প্রত্যাশার আনন্দ নিঃশ্বাস। আমাদের পূর্ব পুরুষ সমস্ত উপমহাদেশ শাসন করেছিলেন।

ছয়. আমি চাই আমার দেশের প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের মধ্যে চাক্ষুস পরিচয় ও বন্ধুত্বের লেন–দেন হোক।

সাত. বিনা স্বার্থে কেউ আমাদের সাহায্য করবে না। অথচ যে সম্পদের বিনিময়ে অর্থের প্রাচুর্য ঘটে তা আমাদের দেশের পেটের ভেতরে জমা আছে। আমরা তুলতে পারছি না বা তুলতে দেয়া হচ্ছে না।

আট. আমাদের যে তেল সম্পদ আছে যা আল্লাহর নিয়ামত। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমাগত বাধার ফলে তুলতে পারছি না আর তোমাদের ভাগ্য ফেরাতে পারছি না। আমার জীবদ্দশায় সম্ভবপর না হলে তোমরা, আমার ছেলেমেয়েরা এই তেল তুলবে।

আর সেই হিজবুল বাহার জাহাজের যাত্রায় তার সেই বিখ্যাত বক্তব্য ও পরিবেশ এবং আগামী দিনের মেধাবীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া সবই প্রমাণ করে সেই নৌ যাত্রাটি আমাদের দেশের জন্য ছিল একটি বিরাট ঘটনা। সেই যাত্রায় আমার বাংলাদেশকে জিয়া একটি দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন যা আমরা অনুসরণ করতে পারলে আজকের বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারের মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করতে পারবো।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে
alamgir-labu@yahoo.com

অসভ্য

- সৈয়দা ফাতিমা হেনা

জীবন বহমান, জীবন চলমান সাগরের মতো, নদীর মতো। এই দীর্ঘ জীবনে মানুষ নানান পথে, নানান ঘাটে বিভিন্ন বিষয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ইতিমধ্যে আমি আকাশ পথ, সড়ক পথ, নৌপথ এবং জাপানের দ্রুতগামী রেলপথ (সিনকান সেন) সবগুলো রুটেই যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

প্রথম আকাশ পথ আমাকে যেমন আনন্দিত, রোমাঞ্চিত করেছে তেমনি দ্রুতগামী ট্রেন জাপানের সিনকান সেনের প্রথম ভ্রমণ আমাকে অনুরূপ আনন্দিত রোমাঞ্চিত করেছে। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে আমার কিশোরীবেলার প্রথম নৌ ভ্রমণই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ যাত্রা, বেশি আনন্দদায়ক ভ্রমণ। গ্রাম বাংলার বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি, বাতাস আর জলের আনন্দ ধ্বনির মাঝে আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম ও মাঝে মধ্যে আজও বিশ্বাস করি জলেরও শক্তি আছে, আছে প্রাণ। বাতাসের সঙ্গে ছোট ছোট ঢেউ তুলে জলের মিতালি, কথোপকথন সেই প্রথম দুই চোখ ভরে দেখেছিলাম, দুই কান দিয়ে শুনেছিলাম। এবং তখনই আমি জলের মাঝে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলাম।

মায়ের আত্মীয়ের বাড়ি ফতেপুর। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামটির বিরাট অবদান আছে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী নিয়ে এখানে অবস্থান এবং তার দলবলের ট্রেনিং এ গ্রামেই নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কাদের সিদ্দিকী বিস্তারিত বলতে পারবেন। প্রসঙ্গটি ভিন্ন।

সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। এই জাতীয় বৃষ্টি আমার একেবারেই অপছন্দ। মুষলধারে বৃষ্টির মাঝেই পাই জীবনের আনন্দ যা ময়লা গ্লানি ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, টিনের চালে ঝম ঝম শব্দে অঝোরে ঝরবে, গাছের পাতায় পাতায় দাপাদাপি করবে।

দুপুরে বৃষ্টি কিছুটা থেমে গেলে মাসহ আমরা চার বোন মামাদের পরিবারের সঙ্গে ফতেপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। জীবনের প্রথম নৌ ভ্রমণ। জীবনের সেই বয়সটা এমনই যে, ক্ষুদ্রতেই আনন্দ, ক্ষুদ্রতেই দুঃখে ভেঙে পড়া।

নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা ধরে নয়। সিংহরাগী গ্রামের বিস্তৃত হাওড়, বাওড়–এর ওপর দিয়ে আমাদের ভাড়া করা পানসি নৌযানখানা যাত্রা শুরু করলো। মাঝি রঙিন পাল উড়িয়ে দিয়েছিল। ভরা বর্ষাও পানির ওপর ধানের গাছগুলোর মাথা জেগে ছিল। আমাদের পানসিটি ধান গাছ মাড়িয়ে যখন যাচ্ছিল, আমার বেশ খারাপই লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে দেখেছিলাম, ফেলে আসার পথ দিয়ে ধানের মাথাগুলো আবার সতেজ হয়ে দাড়িয়ে আছে।

মামারা সঙ্গে করে তাদের গ্রামোফোন সেটটি নিয়েছিলেন। বাজানো হলো আব্বাসউদ্দিনের প্রাণ উজাড় করা পল্লিগীতি। সেই মরমী গানের সুর আছড়ে পড়লো সিংহরাগীর বিশাল জল প্রান্তরে। আমার মনে হলো, ঝিরি ঝিরি বাতাস আব্বাসউদ্দিনের গানের সঙ্গে মিশে জলের ওপর নৃত্য কেলি শুরু করছে। জলের স্বর, বাতাসের স্বর মিলেমিশে এক সুর হয়ে গেল। আমার সেই কিশোরী বেলায়ই মনে হয়েছিল, এমন দিনেই হয়তো তাকে কিছু বলা যায়। কিন্তু এমন মুহূর্তে বলার চেয়ে না বলা কথাই থেকে যায় বেশি।

বাড়ি থেকে যাত্রাপথে খাওয়ার জন্য নাড়ু–মোয়ার সঙ্গে কাঠালের বিচি ভাজা এবং চাল ভাজা নিয়ে এসেছি। আমাদের নৌকাটি ছিল বিশাল। ভেতরে খুব সুন্দর করে বিছানা পাতা হয়েছে। মা, মামারা শুয়ে–বসে গল্প করছিলেন আর আমি বিশাল জলরাশির সঙ্গে বাতাসের লীলা দেখতে ব্যস্ত।

নৌকাটি বিভিন্ন খাল, বিল, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছিল। চারদিকে পানি থৈ থৈ করছিল। আমার মনে হয় বর্ষায় মানুষের দুর্ভোগ আছে সত্যি। তবু এই বর্ষায়ই যেন গ্রামবাংলা তার যৌবন মেলে ধরে। প্রায় বাড়িতেই কলাগাছের ভেলা এবং ডিঙি নৌকা বাধা আছে। অনেকেই মাছ ধরায় ব্যস্ত। হঠাৎই দূর থেকে বিয়ের গান বাজিয়ে আমাদের নৌকার পাশ কাটিয়ে চলে গেল বর–কনেসহ একটি মাঝারি সাইজের নৌকা। আমরা সবাই উকি–ঝুকি দিয়ে বর–কনে দেখতে চেষ্টা করলাম।

কিছুটা উপুড় হয়ে শুয়ে পানিতে হাত ডুবিয়ে বিলি কেটে খেলছিলাম। হাতের নাগালে পেলে কলমির ডগাগুলো হাত দিয়ে নাড়া দিচ্ছিলাম। দূরে লাল–শাদা শাপলা ফুল যেন হেসে হেসে মাথা নাড়ছিল। মাঝে মধ্যে নজরে পড়ছিল থোকা থোকা কালো পানি পোকা অনরবত একজোট হয়ে ঘুরছে। মাকড়সা জাতীয় এক ধরনের পোকা কলমির এ ডগা থেকে ও ডগায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

এ সময় মামার উচ্চ কণ্ঠ শুনে আমরা চমকে উঠলাম।

মামাতো ভাইটি মাঝির দাড় নিয়ে কসরত করছিল। দাড়টি ভেঙে যেতে পারে ভেবে মামা বার বার তাকে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু সে শুনছিল না।

মামা ভীষণ রাগ করে তাকে পাঠ্যবই পড়তে বললেন।

মামার এটি বিশেষ রোগ। মামা ছেলেমেয়েদের শায়েস্তা করার জন্য দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে সঙ্গে পাঠ্যবই নিতে বলতেন।

আমাদের মামাতো ভাইটি মুখ চূন করে পড়তে বসলে আমরা সবাই হাসতে লাগলাম।

আসার আগে সদ্য যুবা ভাইটি আমাকে বলেছিলেন তার নানির পাশের বাড়ির মেয়েটিকে তিনি খুব পছন্দ করেন। একবার তার হাত ধরেছিলেন বলে মেয়েটি তাকে অসভ্য বলেছিল। এবার অনেক দিন পর তিনি যাচ্ছেন। কাজেই মেয়েটি নিশ্চয়ই তার ভালোবাসার মর্যাদা দেবে। আমাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন সম্ভব হলে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমি পাঠ চেষ্টারত ভাইকে দেখে চুপি চুপি হাসলাম।

বিকেল হতেই আবার ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস। কালো মেঘে পুরো জল প্রান্তরকে ঢেকে ফেললো। আমরা সবাই গাদাগাদি করে নৌকার ভেতরে বসে পড়লাম।

মাঝিরা নৌকার পাল নামিয়ে ফেললো।

নৌকাটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো।

আমাদের ঠোট কাটা ছোট বোনটি কৌতুক করে গান ধরলো, *আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই*।

সবাই হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলাম। এ সময় নৌকার ছোট জানালা দিয়ে আমি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। কবি লিখেছেন, *জল পড়ে পাতা নড়ে*। সত্যিই অঝোর ধারে বৃষ্টি যখন পড়ছিল, জলের ওপর ভেসে থাকা লতা–পাতার সে কি আনন্দ উল্লাসে নাচানাচি!

আমার মনে হলো, পুরো খাল–বিল, গাছ–পালা যেন আনন্দে দাপাদাপি করছে। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! তীব্র বৃষ্টির কারণে পুরো এলাকা নজরে আসছিল না। আমার পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। জীবনের প্রথম সেই নৌ ভ্রমণ আমাকে দিয়েছিল শ্রেষ্ঠ আনন্দ। আমার মন ভাবাবেগে আত্মহারা হয়েছিল।

হঠাৎ হাতের ওপর কারো গরম হাতের চাপ অনুভব করলাম। চমকে উঠলাম। আমার মামতো ভাইটি সবার অলক্ষ্যে আমার হাতটি চেপে ধরেছে। রাগ হলো। অসভ্য প্রেমিক।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

সান্ত্বনা

- মোহাম্মদ সোহেল রানা

গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বেড়াতে যাই মামাবাড়ি। মামাবাড়ি আত্রাই নদীর পূর্ব প্রান্তে বাঙ্গাবাড়ি নামক গ্রামে। গ্রামটি মোহনপুর থেকে উত্তর পাশে দুই কিলোমিটার দূরে। গ্রীষ্মের গরমের প্রখরতা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে বের হই নদীর তীরে প্রবাহিত সমীরণে গা ভাসাতে। দুষ্টামি আর খেলার নিয়তে দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি। সে কি আনন্দ, জীবন যেন সার্থক! কতো সময় এতো জোরে দৌড়াই যে, নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। একবার দৌড়াতে দৌড়াতে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ি নদীর কিনারায় পানিতে।

ভদ্রমহিলা পানিতে লাফিয়ে পড়ে পানি থেকে ডাঙায় তোলেন আমাকে। আমার কপালে চুমু দিয়ে আদর করে বললেন, বাড়ি যাও, গিয়ে পোশাক বদলাও।

আমিও স্নেহ পেয়ে খুশিতে মামাবাড়িতে যাই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এরপর থেকেই তিনি আমাকে সন্তানের মতো আদর করতেন।

এটা ছিল আমার বারো বছর বয়সে কথা। এখন আমি যুবক। এখনো মামার বাড়িতে গেলে মায়ের মতো সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাই। নৌ ভ্রমণ বিষয়ে আমার লেখার মূল উপজীব্য হলো এই ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলার বয়স বর্তমানে পঞ্চাশ। বিশ বছর বয়সে তার বিয়ে ঠিক হয় নদীর পশ্চিম তীরবর্তী গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর বরযাত্রী নৌকায় করে নদীর অপর তীরে তাদের গ্রামের দিকে রওনা হয়। অর্থাৎ বিয়ের যাত্রা নৌ ভ্রমণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পশ্চিম তীরে দণ্ডায়মান ও অপেক্ষমাণ বরপক্ষের আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি বর–কনের নৌকার ওপর। সকলে কনে দেখার আশায় ছটফট করছে, অপেক্ষার প্রহর গুণছে।

বর–কনের নৌকা যখন নদীর মাঝপথে তখন অপেক্ষমাণ স্বজনরা লক্ষ্য করলো, ঝপাৎ করে নৌকা থেকে পানিতে কে যেন লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নৌকা থেকে তিন চারজন পুরুষ পানিতে লাফিয়ে পড়লো। তাদের মন নৌকা ডুবির আশংকায় আতকে উঠলো। অনেক পরে খবর এলো কনে পানিতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবল কয়েকজন লোকের পারদর্শিতায় কনেকে সাতরিয়ে তার বাবার গ্রামে উঠানো হয়। নদীর ওপরে উঠানোর পর দেখা গেল কনে অজ্ঞান।

গ্রাম্য ডাক্তারের সহযোগিতায় সেদিন কনের জ্ঞান ফিরলেও কোনো দিন তার শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করা হয়নি।

কনে ছাড়ায় বিষণ্ন মনে ফিরে এলো বর নিজ গ্রামে।

পরদিন চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দেয়ায় বিয়ের পর কনে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

বর ক্ষোভ ও লজ্জায় তার বৌকে কখনো ফিরিয়ে আনতে যায়নি। অন্যদিকে মেয়েটির বিয়ের কথা শুনে তার প্রেমিকও নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে। ফলে মেয়েটি বধূ হতে পারলেও বধূর অধিকার হারিয়ে ফেলে। এমন ঘটনার পর অন্য কেউ কি তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে? হয়তো বা না। ঠিক তাই তার কপালে ঘটেছিল। কি অদ্ভুত নিয়তির খেলা।

বিষের ভরা পেয়ালার মতো এক বুক জ্বালা, তীব্র কষ্টে মেয়েটি বিয়ের পর ত্রিশটি বছর কাটিয়ে চলছে বাপের বাড়িতে। মা হওয়ার ব্যর্থতা এবং স্বামীকে আপন করে না পাওয়া যে কতো কষ্টদায়ক তা ভুক্তভোগী নারীই কেবল জানে। তাই তো সেই ছোট্টবেলায় তিনি আমাকে সন্তানের আদর দিয়েছিলেন।

তখন বুঝিনি তার দুঃখ। কিন্তু এখন জেনেছি তার জীবনের দুর্দশার কথা। ফলে তাকে একটু আশ্বস্ত করার জন্য, ছেলের অনুভূতি একটু অনুভব করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তার কাছে যাই এ জন্য যে, স্বামীকে কাছে না পান অন্তত মৃত্যু পর্যন্ত যেন ছেলে রূপে আমাকে কাছে পান। হয়তো বা এটাই হবে তার সান্ত্বনা।

উত্তর শিবপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর থেকে

অস্ট্রিচের আগে ও পরে

- পুতুল

ছোট্ট একটি শহর। এই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রূপসা নদী। এই ছোট শহরে ছিল আমার বসবাস। এ শহরে জন্ম আমার, এ শহরেই বেড়ে ওঠা। স্কুল, কলেজ সব এই শহরে। তারপর এক শহরের অচেনা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ করেই। বিয়ের পিড়িতে বসতেই পুরনো অনেক স্বপ্ন হারিয়ে গেল। শুরু হলো নতুন স্বপ্নের জাল বোনা।

প্রত্যেক নারী ও পুরুষের জীবনে তার স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে কোনো একটি ছবি থাকে। সে ছবি তার চেহারার নয়, তার মনের। সবারই স্বপ্ন থাকে তার মনের মানুষটি তার মনের মতো হোক। সম্পূর্ণ না হোক আংশিক মিল সবারই কাম্য। তাই বিয়ের আগে আধুনিক সমাজের নতুন পদ্ধতি, দুজনের পরিচয়। এই পরিচয়ের ফলে দুজনের দুজনকে বুঝতে সুবিধা হয়। তবে কেউ যদি পাকা অভিনেতা হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

দুজন ফোনে আলাপের মাধ্যমে দুজনকে বোঝার চেষ্টা করলাম। আমি যেমন তেমনই প্রকাশ করলাম নিজেকে। কিন্তু আমার স্বামী তার ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে নিজের আসল চরিত্র ঢেকে রাখলো। তার নকল চেহারা আমাকে মুগ্ধ করলো। সম্মত হলাম বিয়েতে। বিধাতার ইশারায় একদিন সম্পন্ন হলো বিয়ে।

আবেগ সর্বস্ব আমি। যার সঙ্গে বিয়ে হলো তাকে ধ্যান-জ্ঞান করে ফেললাম। তার সব কিছুতেই মুগ্ধ হতে থাকলাম। সে নিজেকে আড়াল করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাকে অচেনা গন্তব্যে। মাঝে মধ্যে ভাবি, সবটা হয়তো বা অভিনয় ছিল না। ভুল করে হয়তো বা মাঝে মধ্যে ভালোবাসতো আমাকে। আমার নতুন স্বপ্নের মাঝে একটা স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে হানিমুনে যাওয়া। তার সঙ্গে, শুধু তার সঙ্গে একান্তে কিছু সময় কাটানো যা আমার স্মৃতি হয়ে থাকবে সারা জীবন।

পাশের দেশ ইনডিয়ার কাশ্মিরে যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। খুব ইচ্ছা ছিল কাশ্মিরের হ্রদে হাউসবোটে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যাবো কোনো অচেনা জগতে। বিয়ের সময় সে ছিল বেকার। তারপরও অনেক

বাঙালি নারীর মতো বেকার স্বামীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যাস ছিল। তাকে মাঝে মধ্যেই বলতাম, তুমি চাকরি পেলে আমরা ঘুরতে যাবো, তুমি আমাকে কাশ্মির অথবা সিমলা নিয়ে যাবে।

সে বলতো, কাশ্মিরে যুদ্ধ।

তারপরও স্বপ্ন দেখতাম, হাউস বোটে করে সে আর আমি ঘুরছি সেই ভূস্বর্গে। তারপর আবদার করতাম যদি ওই সব জায়গায় নিয়ে যেতে না পারো তাহলে কক্সবাজারই না হয় নিয়ে গেলে।

সে আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতো না। আশা দিয়ে আদায় করে নিতো নিজের সব প্রয়োজন।

অনেক আশায় কেটে গেল বিয়ের একটি বছর। বিয়ের বছর ঘুরতেই নিজের ভেতর অনুভব করলাম আরেকটি প্রাণের। হঠাৎ তার এই আগমন আমাকে খুব বেশি আনন্দিত হতে দিল না। তার বেকারত্ব তাকেও দিল না পূর্ণ খুশি। তারপরও আমাকে সম্পূর্ণ দখল করতে পেরেছে এই মানসিকতা তাকে খুশি করলো। খবরটা যখন নিজে জানলাম তখন দুই মাস পার হয়ে গেছে। খুশিতে নেচে ওঠার মতো অবস্থা নয়। কারণ অনেক। স্বামীর আয়ের পথ টিউশনি। সেই অর্থে বেকারই বলা চলে।

যাহোক, মা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। লেডি ডাক্তার সব পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষ করে রায় দিলেন তিন মাসের ভ্রমণ নিষিদ্ধ।

স্বামীর আবাস ঢাকা। আমাকে তার কাছে পৌছাতে হবে। সে এলো আমাকে নিয়ে যেতে। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী নৌপথে যাত্রা করবো। আকাশ পথে ভ্রমণের খরচ বেশি ও কিছু পথ বাসে যেতে হয়। ঠিক হলো অস্ট্রিচ রকেটে আমরা যাবো। রাত তিনটায় এক নাম্বার ঘাট থেকে রকেট ছেড়ে পরদিন সারা দিন, সারা রাত পার করে সকাল নয়টায় সদরঘাট পৌছাবে রকেট।

যাত্রার দিন আমার বান্ধবীরা এলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমার স্বামীকে বললো, দুলাভাই, রকেটে যাবেন, পিকনিক পিকনিক একটা ব্যাপার, খুব মজা হবে।

সে উত্তরে বললো, মালামাল জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে আমি বাসেই চলে যাবো। এতোটা পথ যাত্রা বিরক্তিকর।

তার মন্তব্য চুপ করে শুনলাম। রাত তিনটায় তো আর যাওয়া যায় না। রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে আমরা বাসা থেকে রওনা দিলাম। বারোটার মধ্যে আমরা পৌছে গেলাম জাহাজে। প্রচণ্ড আনন্দ অনুভব করছি। কারণ সে নিরুপায় হয়ে আমার সঙ্গে চলছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করছে। তবে তাতে আমার আনন্দ কমছে না।

কাশ্মিরের হাউসবোটে না হোক অস্ট্রিচের সেকেন্ড ক্লাস ক্যাবিনে তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম রাত তিনটায়। খুশিতে ঘুম আসছে না। বার বার রেলিংয়ের ধারে যাচ্ছি। অসুস্থ শরীরে মাঝে মধ্যে শুয়ে–বসে থাকছি ক্যাবিনের খাটে। পানির ওপর দিয়ে ভেসে চলছে জাহাজ। সম্পূর্ণ একটা দিন ও দুটো রাত তাকে কাছে পাবার আনন্দে আমি বিভোর। ঢাকায় শহরের ব্যস্ত জীবনে তাকে আমি কাছে পাই না তেমন রাতে ঘুমানোর সময় ছাড়া। সঙ্গে আমার ওয়াকম্যানে গান শুনছি এবং তার সঙ্গে গল্প করছি।

সে মাঝে মধ্যেই বলছে, এতো ঘণ্টা চুপচাপ এই জাহাজে তোমার কাছে থাকা, বাথরুমে যাওয়া, গোসল, খাওয়া ছাড়া কোনো কাজ নেই। ভাবতেই বিরক্ত লাগছে।

কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছিল। কারণ একান্ত কিছু সময় যা শুধু তার আর আমার হয়ে থাকবে। তাই আমি এ ভ্রমণই পেয়েছিলাম। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো হাউসবোটের সাধ জাহাজের ক্যাবিনে মেটাতে হলো। দুজনে একা কাটানো সম্ভব হলো না। তৃতীয় একটা প্রাণ ছিল আমার শরীরে। তারপরও এই নৌপথ ভ্রমণ আমার জীবনের এক খণ্ড সুখ স্মৃতি।

সেই সময় আমার স্বামী ছিল আমার কাছে দেবতা।

দেবতার পর যখন দানবের রূপ ধারণ করলো তখন আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গুড়িয়ে গেল। আমার এক মাত্র কন্যাকে নিয়ে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। একাই আছি, মাঝে মধ্যে তাকে অনুভব করি। তার দানব চরিত্র নয়, অনুভব করি তার নকল চেহারার। কতোই না ভালো ছিল সে দিনগুলো যেদিনগুলোতে সে ভালোবাসার অভিনয় করতো। অস্ট্রিচের ক্যাবিনের জানালা দিয়ে প্রকৃতির কতো দৃশ্য দেখে আমরা সময় পার করেছি। পরে আরো দুবার অস্ট্রিচে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু সেই আনন্দ পাইনি। কারণ সে আমার সফরসঙ্গী ছিল না। তার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কাশ্মির, সিমলা, তাজমহল। কিছুই হয়নি। সে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমার কল্পনায় সে এখনো আছে।

কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে মনে হচ্ছিল সে আমার পাশে পাশেই আছে। তবে প্রিয় খাবার, তার প্রিয় গান, তার কথা আমাকে মাঝে মধ্যে ভাবায়। তাকে অনুভব করি যখন স্মৃতির পাতা ওলটাই। তার চরিত্রের কালো অধ্যায় বাদ দিলে সে ভালোই। তবে তার অন্যায়, সন্তানের প্রতি তার অবিচার এবং তার পরকীয়া প্রেম আমার সুখে কালিমা লেপে দিয়েছে।

খুলনা থেকে

অভিজ্ঞতা

- সুস্মিতা ফাতেমা

এক.

একবার ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছি। তখন যমুনা সেতু তৈরি হয়নি। ভুয়াপুর থেকে লঞ্চে উঠেছি। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর মাঝ নদীতে হঠাৎ দৃশ্য কেমন বদলে যেতে লাগলো। আমরা ক্যাবিনের জানালা দিয়ে দেখি কেমন সব ঘুরপাক লাগছে।

মানুষজন শোরগোল করে উঠলো।

আমার সঙ্গে মামি, ছোট খালা, খালু এবং ছোট্ট খালাতো ভাই ছিল। আমরা বাইরে বের হয়ে দেখি নদীর মাঝখানে লঞ্চ অনবরত চরকির মতো ঘুরছে।

লঞ্চের সারেং নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, সামনেও আগাতে পারছে না।

হই চই, চিৎকারে যা শুনলাম, লঞ্চ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কোনো রকমে ডাঙায় ভেড়াতে পারলেই হয়।

আমার ছোট খালা তো কান্না শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের ভয়ে অবস্থা কাহিল।

সবাই আল্লাহর নাম ধরে ডাকছে।

পানিতেও কেমন যেন ঘূর্ণি।

সারেং বহু কষ্টে লঞ্চকে ডাঙার দিকে নিয়ে গেল। সবাইকে সাবধান করে দিলেন। কারণ প্রচণ্ড জোরে ডাঙার সঙ্গে লঞ্চ ধাক্কা লাগলো। ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে যে যেখানে পারে নামতে লাগলো।

নিচে কাদাযুক্ত পানি, কোথাও মাটি। মানুষের চাপাচাপিতে নামার জায়গায়ও পাচ্ছিলাম না। কাঠের রেলিংয়ের ফাক গলে কোনো মতে বেরিয়ে এলাম।

ছোট খালা আমার কোলে খালাতো ভাইকে তুলে দিলেন।

যেহেতু এটা কোনো ঘাট নয়, তাই পুরুষরা লাফিয়ে নামতে পারলেও মহিলারা শাড়ি পরার জন্য নামতে পারছিলেন না। কি নিদারুণ কষ্ট আর ভয় নিয়ে তাদের ধরে নামাতে হচ্ছিল।

খালা এর মাঝে ব্যাগগুলো ছুড়ে মারলেন।

আমি সেগুলো ধরে রাখলাম।

সেখানে গ্রামের মানুষেরা ছুটে এলো। তখন মানুষজন চিন্তাও করতে পারছিল না কি করবে। অনেকগুলো শ্যালো নৌকা সেখানে ভিড়তে লাগলো। বিপদ দেখে তারাও সে রকম দাম হাকাতে লাগলো যেহেতু যমুনা একটা বিরাট নদী এবং সিরাজগঞ্জ তখনো বহু দূর।

খালা কিছুতেই শ্যালো নৌকায় চড়তে চাচ্ছিলেন না।

আমিও কোনো দিন চড়িনি।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাতেই চড়ে যাত্রীরা চলে যাচ্ছিল।

একেবারে শেষে একটা শ্যালো নৌকায় বাধ্য হলাম চড়তে। কারণ যেতে তো হবে।

নৌকায় ওঠার পর তার দুলুনি এবং বড় বড় ঢেউ দেখে ভয় লাগছিল। তাছাড়া মাথার উপর গনগনে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ। সেই নৌকায় মানুষও ছিল অনেক। গরমের চোটে সবার গলা শুকিয়ে কাঠ। ইঞ্জিন নৌকার জন্য গতি ছিল বেশি আবার মানুষের ভারে নৌকা ডুবুডুবু অবস্থা।

আমার ছোট খালাতো ভাইটা চিৎকার করে কাদছিল।

নদী থেকে পানি তুলে তার গায়ে ছিটানো হচ্ছিল।

অনেক লোক গায়ের কাপড় খুলে নদীর পানিতে ভিজিয়ে গায়ে মাথায় জড়িয়ে রাখছিল।

কারো কাছে খাওয়ার একটু পানি ছিল না। সবাই ভাবছিল আর কতো দূর, কখন পৌছাবো।

অবশেষে সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌছালাম। ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে বাচলাম। কখনো ভুলতে পারি না সেই দিনের কথা।

দুই.

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুড়বাড়ি যাচ্ছি। সারিয়াকান্দির অনেক ভেতরের গ্রামে। বাস থেকে নেমে আমার দেবর বললো, নৌকায় যাই, তাহলে যেতেও আরাম হবে, নৌপথে ভ্রমণও হবে।

একটা শ্যালো নৌকা ভাড়া করা হলো। নৌকা ধীরে ধীরেই যাচ্ছিল। বাঙালি নদীর আশপাশের গ্রাম, মানুষ, চর এগুলো দেখতে ভালোই লাগছিল। কিছু লোক নৌকায় করে মাছ ধরছিল।

আমার শাশুড়ির সঙ্গে পরামর্শ করে আমার দেবর মাছ ধরা নৌকাকে ইশারায় ডাকলো।

সাবধানে দুই নৌকা কাছে এলে দেখা গেল কয়টা আইড় মাছ ধরেছে।

দরাদরি করে দুটো মাছ কেনা হলো এবং সেগুলোকে নৌকার তলদেশে অল্প পানির মধ্যে ছেড়ে রাখা হলো। তাজা মাছ, দেখতেও ভালো লাগছিল এবং খেতেও সেগুলো মজা হয়েছিল।

আমার প্রথম শ্বশুড়বাড়ি যাত্রা নৌকায় হয়েছিল।

তিন.

অনেক দিন আগের কথা ১৯৭১ সাল। আমি তখন অনেক ছোট। সে সময় মিলিটারির ভয়ে সিরাজগঞ্জ শহর ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছি। নৌকায় আমার দাদা, দাদি, বাপি, মামণি, আমি ও আমার ছোট ভাই বহুদূরের দাদির গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। তখন তো ইঞ্জিন নৌকা ছিল না। লগি ঠেলা আর বৈঠা ঠেলে যাওয়া। খুবই ধীরগতির যাওয়া।

আমরা ছইয়ের ভেতর বসে আছি। হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। বড় বড় ফোটার বৃষ্টি। নদীর শান্ত পানিতে সেই ফোটাগুলো যখন পড়ছিল দেখতে অপূর্ব লাগছিল। সব শিশুদের মতো আমাদের ধারণাও হচ্ছিল এগুলো মাছ লাফ দিচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দ আর চারদিকে ঘোলা হয়ে যাওয়ার মাঝে সেই বৃষ্টির ফোটাগুলো এক অনির্বচনীয় আনন্দ সৃষ্টি করেছিল আমাদের এই দুই শিশুর মনে। মনে হয় নদীর মাঝে বৃষ্টির দৃশ্য পৃথিবীর সেরা।

পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা থেকে

নীল তরল

- স্বাতী আহমেদ

গ্লাসে ভরা খাবার পানি আর টয়লেটে বদনা ভরা পানি ছাড়া যে কোনো পানিতেই আমার ভীষণ ভয়। *একুয়া ফোবিয়া* বলে কি কিছু আছে?

ছোটবেলায় নানাবাড়ির গ্রামে একবার আমার ছোট মামা আমায় অতি ভালোবেসে, যত্ন করে নদীর পানিতে চুবিয়ে গোসল করিয়েছিলেন। তার ভালোবাসা আর যত্ন আমার চোখে নানান রঙের তারাবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে (নিঃসন্দেহে পানির নিচে চোখ খুলেছিলাম), ছোট একটি পানি ভীতির বীজ বপন করেছিল আমার তৎকালীন ছোট মস্তিষ্কে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজটিও ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ডালপালা মেলেছে নিওরো ট্রান্সমিটারের মতো মস্তিষ্কের কোষে। তাই *পানিপ্রীতি* নামে কোনো কিছুই ছায়া মাড়াতে পারেনি আমার ধারেকাছে। ভেবেছিলাম এভাবেই চলবে জীবনের বাকি সময়টা।

সমস্ত ব্যাপারটাতে অন্য মাত্রা যোগ হলো *লেক হাভাসু* গিয়ে। অ্যারিজোনা মরুভূমির ফিনিক্স নামের শহরটির যেখানে আমাদের বাসা সেখান থেকে পাক্কা চার ঘণ্টা লাগে গাড়িপথে লেক হাভাসু যেতে। বেলা পার করে রওনা হওয়ায় আমরা পৌছালাম ঘন সন্ধ্যায়। ভ্রমণ ঋতু না হওয়াতে *লন্ডন বৃজ* নামে রিজর্টটিতে (Resort) রুম পেয়ে গেলাম অতি শস্তায়। চাদনি রাত, দূরে কলরেডো নদীটি আবছা দেখতে গেলাম।

সকালে স্বামী সন্তানের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ আর মৃদু হুমকিতে ঢেকি গেলার মতো কলরেডো নদীতে স্টিমার ভ্রমণে রাজি হলাম। এটি একটি বড় চাকা লাগানো সুন্দর অত্যাধুনিক বাহন যার বাইরের আবরণটি পুরনো আমলের মতো। এটা আমেরিকানদের শখ যে, তারা ঊনবিংশ শতাব্দী বা তারও আগের জীবনযাত্রার অনুকরণে সব সাজাতে পছন্দ করে। অবশ্য তা খোলস। কারণ ভেতরে সবই অতি আধুনিক।

যাহোক, স্টিমারে উঠেই শীত লাগলো খুব। একে তো ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়েই ছিল, উপরন্তু নদীর ওপরকার হাওয়া ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় আরো ঠাণ্ডা হয়ে আমাকে হিম করে দিল। স্টিমারটির ওপর তলায় একটি রুম দেখে দৌড়ে সেখানে গেলাম। কিন্তু ওটা ছিল বার (Bar)। সবাই নানান রঙের পানীয় নিতে ব্যস্ত। ওটুকু সময়ের মধ্যেই অ্যালকোহলের গন্ধ নিশানা করলো আমার মাইগ্রেনকে। আমি দৌড়ে ডেকে গিয়ে ধপাস করে মাথা গুজে বসে পড়লাম একটি চেয়ারে। মনে মনে নিকুচি করলাম সংসারের। সংসারে কতো অপছন্দই না মেনে নিতে হয়!

একটু পরে টের পেলাম ঠাণ্ডা বাতাসের যন্ত্রণা কম, রোদের উষ্ণতা মাথা ও পিঠ ছুয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকালাম। নিঃশ্বাস আটকে রইলো ভেতরে। কি অসাধারণ দৃশ্য! সোনা রঙা রোদময় আকাশ নাইতে নেমেছে গভীর নীল পানিতে। নদীর একধার দেখা যায়, আরেকধার বিলীন হয়েছে আকাশে। মনে মনে দৃশ্যমান পাড়টিকে কমপিউটারের মাউস ক্লিকের মতো ক্লিক করে মুছে ফেলে, আমি অবাক বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে গেলাম বিস্তৃত নীল তরল দেখে! এমন সুন্দর দৃশ্য কি কোনো ছবিতে দেখেছি। স্বপ্নে অথবা কল্পনায়? না। কি আশ্চর্য! এই তীব্র সৌন্দর্য কি না বাস্তবে দেখছি। ইচ্ছে হলো এই ভ্রমণ যেন সময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে চলতে থাকে অনন্তকাল।

স্বামী মাইগ্রেনের ওষুধ *ইমিটেক্স* এবং এক বোতল পানি এনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেল মাথা ব্যথা নেই। থাকবে কি করে? অপার্থিব সৌন্দর্য মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেছে যে! অন্য সমস্ত অনুভূতি ভেসে গেছে এই অসাধারণ সৌন্দর্যের প্লাবনে।

বাস্তবে কলরেডো নদী ভ্রমণ শেষ হলো নির্দিষ্ট সময়ে এবং আমরা ফিনিক্স–এ ফিরে এলাম যথাসময়ে। আমার মনের পর্দা জুড়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য রয়ে গেল স্ক্রিন সেভার হয়ে।

পানিভীতি আমার আজও আছে। কলরেডো নদী ভ্রমণ আমার ভয় দূর করতে পারেনি। তবে খুব মন খারাপ হলে গাড়িতে, শপিং মলে বা কলেজের ক্যালকুলাস ক্লাসে রোবটের মতো টিচারের নিরস ও যান্ত্রিক লেকচার শুনতে শুনতে চোখ খোলা রেখেই মনের সেই অংশে ডুব দিই যেখানে প্রতিদিন বয়ে চলে কলরেডো নদী। নির্ভয়ে নীল সোনালি সৌন্দর্য আর সুখে ডুব দিয়ে ধুয়ে ফেলি যে কোনো বিষণ্নতা। তারপর ফিরে আসি বাস্তবে। আসি কি?

ফিনিক্স থেকে
smafamily@msn.com

প্রতিকূল অনুকূল

– মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

রতন ছেলেটা কেমন পাজি। কাল আমাকে চুমু খেয়েছে।

বিপাশার কথা শুনে আমার হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে গেল। যেখানে একটি স্পন্দন হওয়ার কথা সেখানে দুটি হচ্ছে। এমনই হয়। বিপাশার সামনে এলে বুক কাপবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু বিপাশা আমার অনেক ছোটকালের বন্ধু, তার ক্ষেত্রে কেন এমন হয়? আগে তো হতো না! এখন কেন তার সামনে স্বাভাবিক থাকতে পারি না? কেন এক ধরনের জড়তা পেয়ে বসে!

আজ যখন বিপাশা ভেলায় চড়ে বসলো, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। কিছুক্ষণ পর অবশ্য তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এখন তার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন সে আমার চেয়ে বড়। কোনো সংকোচ নেই, কোনো জড়তা নেই, খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে সে। ভাবখানা এমন যেন এসব কথা সকলকে বলে বেড়ানোর জন্যই।

সে সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলে। এটা তার একটি ভালো গুণ। এমনভাবে কথা শুরু করে, পুরো ঘটনা না শুনে পারা যায় না। শুনতে কষ্ট হলেও আমাকে সমস্ত ঘটনা শুনতে হলো।

বুঝলি না আনুভাই, তারা কোথা থেকে যেন একটা রিকশা জোগাড় করেছে। সাজু রিকশা চালাচ্ছিল, রতন বসেছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে রতন বললো, কি রে বিপাশা, রিকশায় উঠবি নাকি? চল, আমরা অনেক জায়গায় ঘুরবো। তুই তো জানিস আমার ঘুরতে খুবই ভালো লাগে। লোভ সামলাতে পারলাম না। উঠে বসলাম রিকশায়। অনেক ঘুরলাম আমরা। শেষে যখন নেমে পড়বো তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই রতন আমাকে চুমু খায়। বিপাশা বলা শেষ করলো।

ঈর্ষার আমার বুক পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। পুড়ে যাওয়ার গন্ধও বের হচ্ছে বুঝি। ঈর্ষা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তা প্রকাশ হতে দিলাম না। নিজেকে সংযত রেখে চুমু খাওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিপাশার মনোভাব জানার চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম, চুমু খেয়েছে তো কি হয়েছে, তুই সুন্দর বলেই তোকে চুমু খেয়েছে।

বিপাশার ঠোট উল্টে বললো, বাহ রে, আমি সুন্দর বলে যে ইচ্ছা সে আমাকে চুমু খাবে?

যে ইচ্ছা সে তো চুমু খায়নি, শুধু রতন চুমু খেয়েছে।

বিপাশা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। চোখ দুটো অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো। কোমল কণ্ঠে বললো, আনুভাই, তুই না একটা...। জানিস, কাল বার বার সাবান দিয়ে গাল ধুয়েছি।

সাবান দিয়ে চুমু ধুয়ে ফেলা যায়। জানতাম না তো!

বিপাশা বুঝতে পারলো রসিকতা করছি। তাই আর কিছু বললো না। একটা দীর্ঘশ্বাস নিল শুধু। এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হয়তো গভীর রহস্য নিহিত আছে যা সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়।

যাক, বিপাশার কথা শুনে বুঝলাম রতন গালে চুমু খেয়েছে। গালে চুমু খাওয়ার চেয়ে ঠোটে চুমু খাওয়া বড় অপরাধ। রতন এই বড় অপরাধ করেনি। তাকে এবারের জন্য ক্ষমা করে দেয়া যায়। রতনের জন্য যে শাস্তি ঠিক করে রেখেছিলাম তা এখনকার জন্য স্থগিত রাখলাম। পরে ভেবে দেখবো তাকে শাস্তি দেয়া যায় কি না।

স্রোতের বিপরীতমুখী যাচ্ছি আমরা। খুব বেশি স্রোত নয়। বন্যায় ডুবে যাওয়া মাঠে–ঘাটে বেশি স্রোত থাকে না। তবুও ভেলা চালাতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে। নতুন চালক তো, তাই। উপরন্তু একজন রূপবতী কন্যাকে ভেলায় চড়িয়েছি। কিছুটা টেনশন তো হবেই। যতোদূর সম্ভব ভেলাটিকে সোজা রেখে জল কাটার চেষ্টা করছি।

বহুদিনের সাধ ছিল বন্যার জল বেশি হলে ভেলা বানাবো। তাতে ভর করে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাবো। এবার সেই সাধ পূরণ হবার পালা।

বন্যার জল শুধু বেশি হয়নি, তা সকলের ঘরে ঘরে পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে। মাঠ–ঘাট ডুবে গিয়েছে। চারদিকে তাকালে শুধু জল আর জল। মনে হয় যেন পৃথিবীর তিন ভাগ নয়, চার ভাগই জল।

বুক ভরা আনন্দ নিয়ে ভোরে উঠে ভেলা বানিয়েছি। ভেলা বানানো একজনের পক্ষে খুবই কষ্টকর। এই কষ্টকর পরিস্থিতি অতিক্রম করেছি। সকালে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি। সহজে ক্ষিধে লাগবে না। ভেলা নিয়ে বের হবো, তখন বিপাশার সঙ্গে দেখা।

বিপাশা বললো, সেও যাবে।

অগত্যা তাকেও নিতে হলো।

বিপাশা অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না। নিচে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু ভাবছে হয়তো। আমার দিকে না তাকিয়েই বিপাশা বললো, রতনদেরকে আমার মোটেই ভালো লাগে না।

তার কথা শেষ হতে দিলাম না। দ্রুত বললাম, হ্যা, বুঝতে পেরেছি। সাবান দিয়ে বার বার মুখ ধোয়া থেকেই বোঝা যায়।

বিপাশা এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালো। তার মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল।

ঈশ্বরের রাজত্বে কে যে কিসে খুশি হয় তা বোঝা যায় না। বললাম, তুই রতনদেরকে বলতে আর কাকে বোঝাচ্ছিস।

ওই যে, রতন, সাজু তাদের সঙ্গে যারা থাকে তাদের কাউকেই আমার ভালো লাগে না।

রতনদের সঙ্গে আমিও থাকি। আমাকেও কি ভালো লাগে না?

হ্যা, সেটাই বলছিলাম। রতনদের সঙ্গে যদি তুই বেশি থাকিস তাহলে হয়তো তোকেও ভালো লাগবে না।

বাপস, তাই নাকি! বয়েই গেছে আমার।

বিপাশা কিছু বললো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর বললাম, এখন কি আমাকে ভালো লাগে?

বিপাশা মিষ্টি হাসি দিল। লজ্জায় মাথা নিচু করে আবেগের কণ্ঠে বললো, প্রচণ্ড রকমের ভালো লাগে। তোকে ভালো না লাগলে কি আর তোর ভেলায় চড়ি?

আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। নিজেকে সংযত রেখে বললাম, রতনদের রিকশাও তো চড়েছিলি।

বিপাশা সহজ গলায় বললো, তা চড়েছিলাম। আচ্ছা, তোকে আমার ভালো লাগে কি না তা বিশেষভাবে বলার দরকার আছে কি?

কোনো উত্তর দিলাম না। তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। এই প্রশ্নের উত্তরও বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। চুপ করে থাকাই এর উপযুক্ত উত্তর।

বিপাশা বললো, তোকে আমার ভালো লাগে বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছি তা কি বুঝেছিস?

এতোক্ষণ যদিও বুঝিনি তবুও এই প্রশ্ন দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল সে কি বোঝাতে চাচ্ছে। আমতা আমতা করে বললাম, হ্যা, বোধহয় বুঝতে পারছি।

ব্যস, ওতেই হবে। এবার তুই কিছু বল।

বিপাশা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষাই যেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমি তখন ছোট ছিলাম। এতোই ছোট যে হেলিকপ্টার এবং প্লেনের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতাম না। আকাশ থেকে হেলিকপ্টার উড়ে যেতো তখন বাইরে বেরিয়ে আসতাম সেটা দেখার জন্য। আমাদের এখানে হেলিকপ্টার খুব একটা দেখা যায় না। যা বিরল তার প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রবল। তবে আমার আগ্রহ যেন একটু বেশি ছিল। কারণ হেলিকপ্টার কিনবো বলে ঠিক করলাম। বড়আপাকে জিজ্ঞাসা করতাম, হেলিকপ্টার কিনতে কতো টাকা লাগে?

বড়আপা হাত দুটো প্রসারিত করে বলতেন, এততো টাকা লাগে।

আব্বা অফিস যাওয়ার সময় প্রতিদিন আমাকে এক টাকা করে দিতেন। এই টাকাগুলো জমাতাম হেলিকপ্টারের জন্য। বিপাশাকে বলতাম, আমি যদি হেলিকপ্টারের কিনি তবে তোকেও চড়তে দেবো। আমরা দুজনে হেলিকপ্টারে চড়ে ঘুরে বেড়াবো।

বিপাশা আমার কথা শুনে মহা খুশি যেন সত্যিই হেলিকপ্টার কিনবো। তারপর আমরা হেলিকপ্টার নিয়ে বিভিন্ন সব অবাস্তব কল্পনায় হারিয়ে যেতাম।

এ ধরনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বাস্তবে পূরণ হয় না। তবে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে হেলিকপ্টারের জায়গায় ভেলা মন্দ কি। বরং হেলিকপ্টারের বদলে ভেলাই বেশি মানানসই।

এই যাহ... ভেলাটি একটি ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমরা প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, বেচে গেলাম। জলের নিচে উচু মাটি রয়েছে। ওপর থেকে সেটা বোঝা যায় না। সেখানে ভেলাটি আটকে গিয়েছে। বৈঠা দিয়ে ভেলাটি সরানোর চেষ্টা করলাম। সরলো না। অগত্যা জলে নামতে হলো। ভেলাটিকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটা নিজ স্থানে অটল থাকলো। বিপাশাকে বললাম নেমে পড়তে। এতে ভেলাটি হালকা হয়ে জলে ভেসে উঠবে। সহজেই সরানো যাবে।

বিপাশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামলো। শুধু নামলোই না, ভেলাটিকে সরিয়ে আনতেও সাহায্য করলো।

দুজনে মিলে ভেলাটিকে সরিয়ে আনলাম। বৈঠা হাতে ভেলার সামনে গিয়ে বসলাম। ভেলার গতি বাড়ানোর জন্য বিপাশাকে বললাম ভেলায় ধাক্কা দিয়ে উঠে পড়তে।

বিপাশা তা-ই করলো। ধাক্কা দিয়ে ভেলার গতি বাড়িয়ে দিল।

সেই গতি ধরে রাখার জন্য দ্রুত বৈঠা বাইতে লাগলাম। বিপাশাকে বললাম উঠে পড়তে।

বিপাশা ধাক্কা দেয়া থামিয়েছে কবে। তবে ভেলায় ওঠেনি। ভেলায় উঠলে নড়ে উঠতো।

যেহেতু ভেলাটি নড়েনি, বৈঠা বাইতে বাইতে চকিতে পেছনে তাকালাম। আমার বুক ধক করে উঠলো।

বিপাশা নেই। কোথায় গেল সে? সেকি জলে ডুবে গেল? ধুত, হাটু জলে কেউ আবার ডোবে নাকি। এখানে কোনো আড়ালও নেই যার পেছনে সে লুকাবে ঠাট্টা করার জন্য। তাহলে বিপাশা গেল কোথায়? একটি জ্বলজ্যান্ত মেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল?

সব কিছু আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। মাথায় কাজ করছে না। বোকার মতো ভেলার ওপর দাড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই আমার। এখানে কোথাও খাল আছে নাকি? জলের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। ওই তো জলের বুদ বুদ উঠতে দেখা যাচ্ছে। নিশ্চিত, ওখানেই ডুবেছে বিপাশা। আগ-পিছ না ভেবে জলে ঝাপ দিলাম।

প্রথমে একটা ডুব দিলাম।

নেই, বিপাশা নেই।

জল থেকে উঠে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। আবার ডুব দিলাম। এবারও বিপাশাকে পাওয়া গেল না। আবার ডুব দিতে যাবো, তখনই হাতে কিছু একটা ঠেকলো। এই তো, বিপাশা। এতোক্ষণ ভুল করছিলাম। বিপাশাকে নিচের দিকে খুজছিলাম, অথচ সে উপরের দিকে আছে।

তাকে টেনে বের করতে যাবো, তখনই বিপাশা আমাকে সম্পূর্ণ আকড়ে ধরলো।

বেকায়দায় পড়লাম। সাতার কাটা তো দূরের কথা, আমার নড়তে সমস্যা হচ্ছে। বাম হাত নাড়াতে পারছি কেবল। কিন্তু একজনকে নিয়ে এক হাতে সাতার কাটা যায় না। সাতারে বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এখন সব ব্যর্থ হতে চলেছে। একজন দক্ষ সাতারু এভাবে জলে ডুবে মারা যাবে! নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হলো। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এক হাতেই সাতার কাটার। হাতটি উচু করতেই হাতে একটি বস্তু ঠেকলো। সৌভাগ্যক্রমে সেটি আমাদের ভেলা।

বিপাশা এই যাত্রায় বেচে গেল, সেই সঙ্গে আমিও। বেশি জল খায়নি সে। নিজেই বমি করে সমস্ত জল বের করে ফেললো। তারপর বিশ্রাম নিল। এখন আর কোথাও যাওয়ার মানেই হয় না। বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

একটি হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। ভেলাটি আমাদের এখানে এলো কি করে? কারণ যখন বিপাশার দিকে ঝাপ দিই তখন আমার শরীরের ধাক্কায় ভেলাটি আমাদের বিপরীতে যাওয়ার কথা। আমাদের এখানে এলো কি করে!

পরে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল। যখন ঝাপ দিই তখন ভেলাটি ঠিকই আমাদের বিপরীতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিকূল স্রোত থাকার কারণে সেটা ভেসে আমাদের এখানে এসেছিল। ভাগ্যিস প্রতিকূল স্রোত ছিল, না হলে...।

আমাদের সকলের জীবনেও কিছু প্রতিকূল ঘটনা ঘটে যা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে চাই না। মনে হয় সব কিছু যেন শেষ হয়ে গেল। অথচ এই প্রতিকূল ঘটনা এক সময় আমাদের অনুকূল হয়ে দাড়ায়।

দক্ষিণ হাজিপাড়া, ঠাকুরগাও থেকে